জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৯তম সংখ্যা

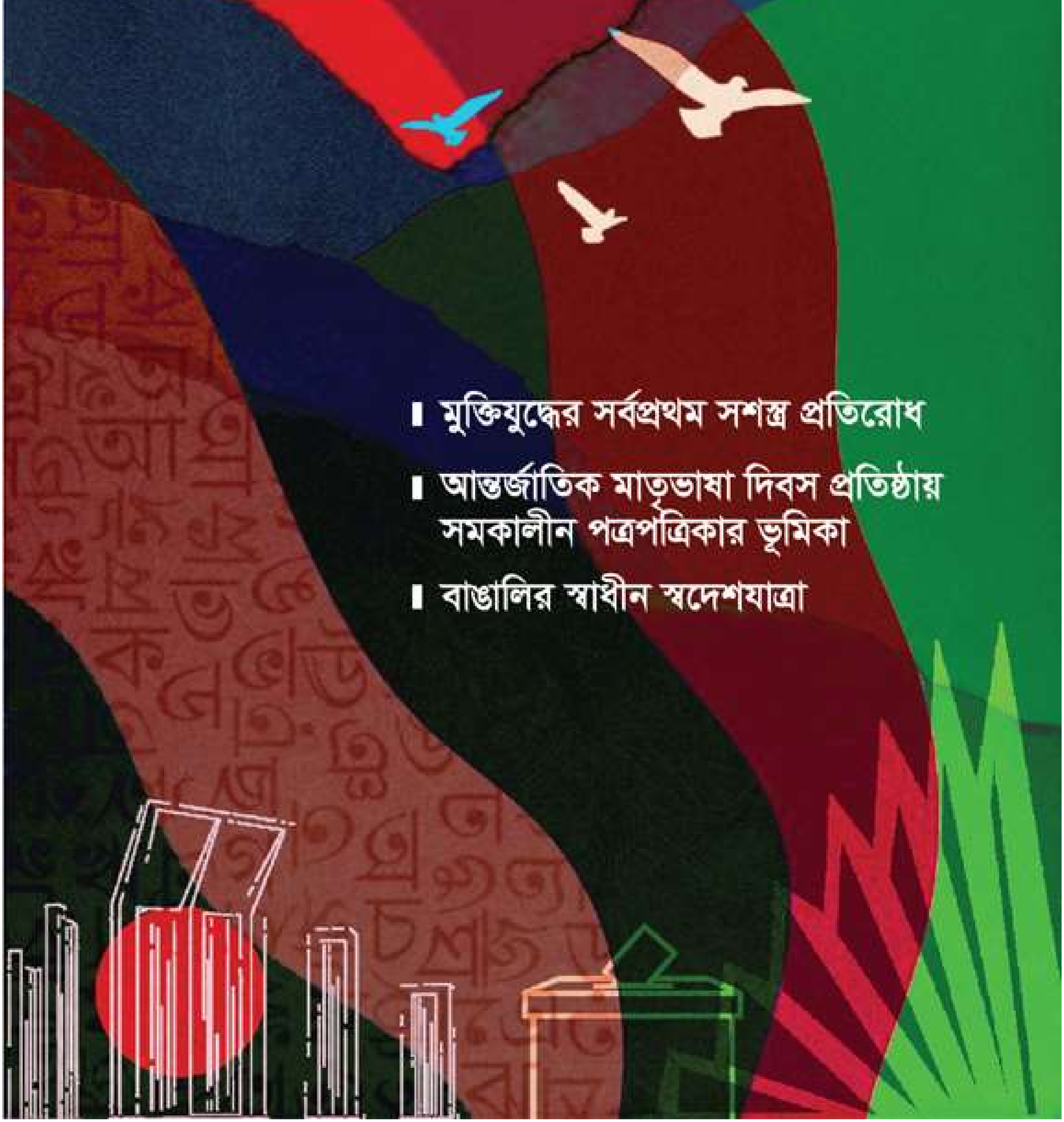

- মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় সমকালীন পত্রপত্রিকার ভূমিকা
- বাঙালির স্বাধীন স্বদেশযাত্রা

নিরীক্ষা

২৪৯তম সংখ্যা: জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

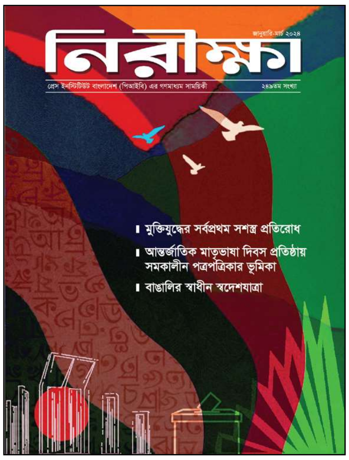

বাঙালি জাতির ইতিহাসে গৌরবময় দিন ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ট্যাংক, কামান, মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ওয়্যারলেস এবং বিশেষভাবে তৈরি বেতারযন্ত্রের তরঙ্গে তা সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। সেই রাতেই রাজারবাগ, পিলখানায় থাকা বাঙালি বীরযোদ্ধারা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অস্ত্র তুলে নেন চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন শহরের সাধারণ মানুষসহ বাঙালি সৈনিকরা। মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত জাতি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রমেই কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

নয় মাস চলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। জাতি এবার যথাযথ মর্যাদায় ৫৪তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। জাতীয় স্মৃতিসৌধে লাখো মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর শহিদদের। আমরা স্বাধীনতার সব শহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যাঁরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বিভিন্ন দেশের ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সব ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে।

পাকিস্তানি শাসকরা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সব রকমের দুঃশাসন কায়েম করেছিল বলেই দুই যুগের দুঃখ-কষ্ট-ভোগান্তির অবসান করতে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানিরা এই দেশটাকে শুধু শোষণই করেছে, বাঙালির কোনো অধিকারই তারা স্বীকার করেনি। এ অব্যাহত শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সত্তরের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে; কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালির হাতে ক্ষমতা না দিয়ে শুরু করেছিল বাঙালি নিধন। চালিয়েছে নিষ্ঠুর গণহত্যা। কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে তারা দমাতে পারেনি। ৩০ লাখ শহিদের রক্ত আর লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র কখনো থেমে থাকেনি। এখনো তারা নানাভাবে সক্রিয়। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। দেশ চলে যায় স্বাধীনতাবিরোধীদের কবজায়। একাত্তরের ঘাতকরা ফিরে আসে রাষ্ট্রক্ষমতায়। দেশকে আবার পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার এবং ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। সব ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। দেশে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার হচ্ছে। দেশ ক্রমে এগিয়ে চলেছে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। অনেক খাতেই বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ নতুন করে এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আমরা মনে করি, দেশের উন্নয়নকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন একাত্তরের সেই ইস্পাতকঠিন ঐক্য। স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অটুট থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথ হয়ে উঠুক মসৃণ।

নিরীক্ষার এ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে খ্যাতিমান লেখকদের সুনিপুণ লেখা দিয়ে। সংখ্যাটিতে রয়েছে প্রবীণ সাংবাদিক এবং কলামিস্ট সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। মুজিবনগর সরকার, কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম সরকারের অস্থায়ী দপ্তর অরবিন্দ ভবনের কার্যক্রমসহ বহু বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীর সাহচর্যে ছিলেন তিনি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ বাংলাদেশে থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করতেন। সাক্ষাৎকারটিতে উঠে এসেছে এসব প্রসঙ্গ। পাঠক-গবেষকদের জন্য সংখ্যাটি সংগ্রহে রাখার মতো।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

কম্পিউটার বিন্যাস
শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৪

মূল্য: ৫০ টাকা

ISBN: 978-984-35-4812-2

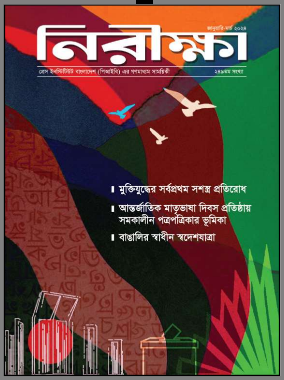

সূ|চি|প|ত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় সমকালীন পত্রপত্রিকার ভূমিকা — ৩
ড. মোহাম্মদ হাননান

যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল — ৬
আলী হাবিব

পঁচিশে মার্চের স্মৃতি — ৮
তোফায়েল আহমেদ

১৯ মার্চ ১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ — ১১
আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু — ১৪
বিপ্লব বড়ুয়া

নির্বাচনি ইশতেহারের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ — ১৮
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

একটি পতাকার লাগি — ২২
কাওসার চৌধুরী

নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিকতা — ২৪
আকিল জামান ইনু

২৮ একাত্তরে চুয়াডাঙ্গা: প্রতিটি মানুষ হয়ে যায় একেকটি যোদ্ধা
মোস্তফা হোসেইন

৩২ জনমনে নির্বাচনি সংস্কৃতির ধারণা তৈরি করে গণমাধ্যম
জুলফিকার আলি মাণিক

৩৪ বাঙালির ‘সাহস’-এর জন্মদিন ১৭ মার্চ
দুলাল আচার্য

৩৭ জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব
শাহনাজ পারভীন এলিস

৪০ পুরো নয় মাস খবরের পেছনে ছুটে শেষ দৃশ্যে থাকতে পারিনি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য –সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত
বনশ্রী ডলি

৪৮ সংবাদপত্রে একাত্তরের মার্চ
মিজানুর রহমান

৫৪ বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
জাফর ওয়াজেদ

৫৭ গণমাধ্যম সংবাদ

৬৭ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি’র সকল প্রকাশনা পেতে: প্রকাশনা কর্মকর্তা পিআইবি, বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

অনলাইনে: www.rokomari.com; মোবাইল: ০১৯১৩০২৪১৫১

মূল্য ৫০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

ফোন : ০২-৪১০৩২৯১৩, ০২-৪১০৩২৯২৫-২৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৪১০৩২৯১৪

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রবন্ধ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় সমকালীন পত্রপত্রিকার ভূমিকা

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোগের প্রতি সংহতি প্রদর্শনে সংবাদপত্রের সরব-নীরব ভূমিকা বরাবরই ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে তখনও কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেনি, অথচ ১৯১৭ সালেই ভারতের জাতীয় ভাষা প্রশ্নে একটা বিতর্ক ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। এমন একটা সময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কী মনে করে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় ভাষা কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের একটা পরামর্শসভা ডেকেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সভায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন বাংলা ভাষাই হতে পারে ভারতের জাতীয় ভাষা। কারণ, তৎকালীন ভারতে বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মত দিলেন হিন্দির পক্ষে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্ভবত এটা মানতে পারেননি। তাই এ সময় (১৯১৭ সালে) কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে ভারতের জাতীয় ভাষা নিয়ে তিনি দীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতাটি *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* প্রথম সংখ্যায়[১] *'আমাদের ভাষা-সমস্যা'* নামে প্রকাশিত হয়। এ থেকে বোঝা যায়, সংবাদপত্র, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা ভাষা প্রশ্নে মানুষের কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে প্রথমদিন থেকেই সচেতনভাবে কাজ করেছে। কাছাকাছি সময়ে *মোসলেম ভারত* পত্রিকাও *'ভারতের সাধারণ ভাষা'*[২] শিরোনামে আরেকটি নিবন্ধ প্রকাশ করে।

পত্রপত্রিকায় এ তৎপরতা দ্রুতই তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৪৭ সালের পূর্বাপর ভাষা-বিতর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে বেশির ভাগ পত্রপত্রিকা বাংলা ভাষার পক্ষেই অবস্থান নেয়। *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ইত্তেহাদ* প্রভৃতি পত্রিকা সেদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলেই ভাষা আন্দোলন সফলতা লাভ করেছিল। এই সফলতার একটি দিক ছিল, বাংলাদেশ বা পূর্ব বাংলার বাইরে ভারতের পশ্চিম বাংলায় বেসরকারিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছে এবং ত্রিপুরা রাজ্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারিভাবে 'বাংলা ভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন এভাবেই বাংলাদেশের বাইরে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলে পালিত হয়ে এর আন্তর্জাতিক ভিতকে প্রথম ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে।

কিন্তু এসবের পরও একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হতে পারে–এমনটা চিন্তাভাবনা কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী, লেখক, ভাষাবিদদের থেকে কখনো আসেনি। বাংলাদেশের গফরগাঁও উপজেলা বিদ্বৎশ্রেণির কোনো উপজেলা নয়, অথচ ১৯৯৭ সালে সেই উপজেলার থিয়েটার সংগঠন 'গফরগাঁও থিয়েটার' একুশের অনুষ্ঠানে প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবি তুলেছিল। ১৯৯৯ সালের একুশের সংকলনেও এই গফরগাঁও থিয়েটার তাদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে। 'অর্ঘ্য'[৩] নামের একটি একুশের পত্রে যা অনেক সময় একুশের সংকলন বলা হয়ে থাকে, সেখানে এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও প্রচ্ছদে '*বিশ্বমাতৃভাষা দিবস চাই ॥ একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই*' শীর্ষক স্লোগানও তারা মুদ্রিত করেছিল। একই বছর গফরগাঁও-এর নাট্যকর্মীরা একুশের বিশ্বমর্যাদা দাবি করে শোভাযাত্রা বের করে, শহরের দেওয়ালে পোস্টার এবং বাসে ও ট্রেনে স্টিকার লাগায়। উল্লেখ্য, ভাষাশহিদ জব্বার গফরগাঁও-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর *বাংলাদেশ অবজারভার* চুয়াডাঙ্গা থেকে পাঠানো পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এম. ইনামুল হকের একটি চিঠি প্রকাশ করে। চিঠিতে ইনামুল হক দাবি করেন, ১৯৯৮ সালের ২৫শে মার্চ তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদাদানের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।[৪]

জনৈক ব্যক্তি 'সুনাগরিক' নামে দৈনিক *বাংলার জনমত*[৫] পত্রিকার ১৯৯৪ সালের ৬ই এপ্রিল সংখ্যায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার উদ্যোগ নিতে চিঠিপত্র বিভাগে একটি পত্র ছাপিয়েছিলেন।

হতে পারে আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা; কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে বড়ো একটা চিন্তার প্রকাশকে তারা আমল দিয়েছিলেন। সেসময় এমন একটা প্রস্তাবনার বাস্তব ভিত্তি আছে, এটা কেউ মনেও করেনি। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কো সম্মেলনে এরকম একটি বিষয় যখন বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে, তখনও কিন্তু দেশের বিদ্বৎসমাজ এটাকে খুব গুরুত্ব দেয়নি। ৪ঠা নভেম্বর প্যারিস থেকে ফিরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) কাছে যে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, অধিকাংশ সংবাদপত্র তা গুরুত্ব দেয়নি। একমাত্র ঢাকার দৈনিক *ভোরের কাগজ* ছাড়া খবরটি কেউ ছাপেওনি। *ভোরের কাগজ*-এর প্রকাশিত খবরটি ছিল নিম্নরূপ:

> একুশে ফেব্রুয়ারি
> **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হতে যাচ্ছে**
>
> জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে। বর্তমানে ফ্রান্সে অনুষ্ঠানরত ইউনেস্কোর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সম্মেলনেই এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটির ওপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। ভোট দেবেন এ সম্মেলনে যোগ দেওয়া ইউনেস্কোর ১৮৮টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। প্যারিস থেকে দেশে ফিরে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক গতকাল বাসসকে বলেন, ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশের এ প্রস্তাবে ইউনেস্কোর সব সদস্য-রাষ্ট্রই সমর্থন দেবে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সদস্য-রাষ্ট্রগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, একুশে ফেব্রুয়ারি একটি সুনির্দিষ্ট দেশের ভাষার সংগ্রামের প্রতীক হলেও এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হলে বিশ্বের সব ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে।
> এ ব্যাপারে তিনি প্যারিসে আসা বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন। তারা সবাই এ প্রস্তাব সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের এ প্রস্তাবের ওপর আগামী সপ্তাহের কোনো একদিন ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে।[৬]

অবশেষে যখন ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষিত হলো, তখনও দেখি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বড়ো বড়ো শিরোনামে প্রথম পাতায় খবরটি প্রকাশ করলেও কয়েকটি পত্রিকা কম গুরুত্ব দিয়ে এক কলামে মাত্র কয়েকটি লাইনে খবরটি পরিবেশন করে। অন্যান্য পত্রিকার এ সংক্রান্ত খবরের শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ:

১. একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা, (*দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।
২. ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, (*ভোরের কাগজ*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।
৩. February 21 now World Mother Language Day: UNESCO adopts Bangladesh Resolution, (*The Independent,* November 18, 1999)।
৪. ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত: একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, (*প্রথম আলো*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।
৫. একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের, (*সংবাদ*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।
৬. অমর একুশে এখন বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস, (*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।
৭. UNESCO Proclaims Feb 21 as Mother Language Day, (*Bangladesh Observer,* November 18, 1999)।
৮. ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত: ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হইবে, (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।
৯. ৪৭ বছর পর স্বীকৃতি: ২১ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, (*আজকের কাগজ*, ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৯)।

সংবাদপত্রগুলোর শিরোনামে আবেগের আতিশয্য ছিল না, তবে কোনো কোনো পত্রিকার শিরোনামের মন্তব্য ছিল উল্লেখ করার মতো। যেমন, *প্রথম আলো* লিখে, 'ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত', আবার *দৈনিক*

জনকণ্ঠ মন্তব্য করে, 'অমর একুশে এখন বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস', আর *আজকের কাগজ*-এর মন্তব্য ছিল, '৪৭ বছর পর স্বীকৃতি'।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষিত হওয়ায় দেশে-বিদেশে বাঙালি জনমানসে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সংবাদপত্রগুলোও তা ফলাও করে প্রকাশ করতে থাকে। এটা ছিল অমর একুশের বিজয়ের এক নতুন মাত্রা। ইউনেস্কোর এ স্বীকৃতি বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেছিল। আর প্রায় ৫০ বছর আগের এ ঘটনার প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখটি সমগ্র দুনিয়াকেই বাংলাদেশ যেন উপহার দিয়েছিল। এ স্বীকৃতির ফলে দুনিয়ার মানুষ জানতে পারে, প্রায় প্রতিদিন বিশ্বে কোনো না কোনো মাতৃভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সাময়িকীগুলো ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলা ভাষা নিয়ে যেরকম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়ে আসছিল, একুশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়া তারই একটি যৌক্তিক ফল লাভ।

তথ্যসূত্র

১. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯১৮।
২. '*ভারতের সাধারণ ভাষা*', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *মোসলেম ভারত* পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৭ (১৯২০ খ্রি.)।
৩. '*অর্ঘ্য*', গফরগাঁও থিয়েটার প্রকাশিত একুশের সংকলনপত্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।
৪. চিঠিপত্র বিভাগ, *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৯।
৫. চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'সুনাগরিক' ছদ্মনামে প্রকাশিত চিঠি, *দৈনিক বাংলার জনমত*, ৬ই এপ্রিল ১৯৯৪।
৬. *ভোরের কাগজ*, ঢাকার দৈনিক, ৫ই নভেম্বর ১৯৯৯।

লেখক: লেখক ও গবেষক

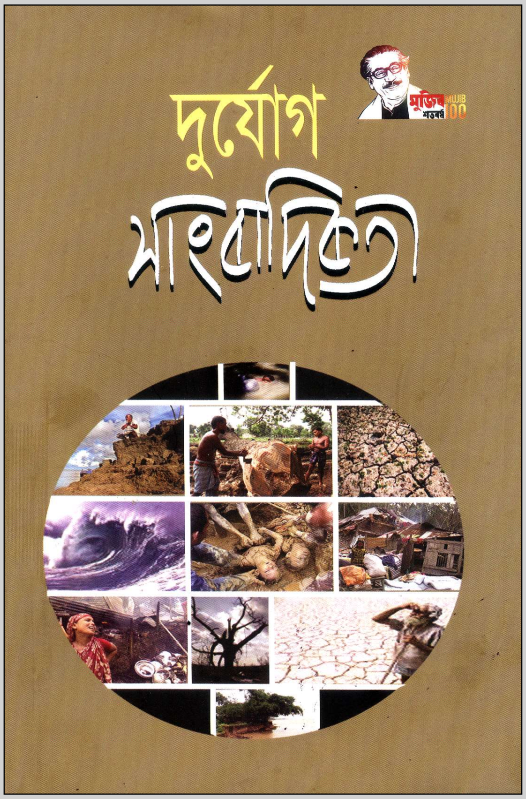

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

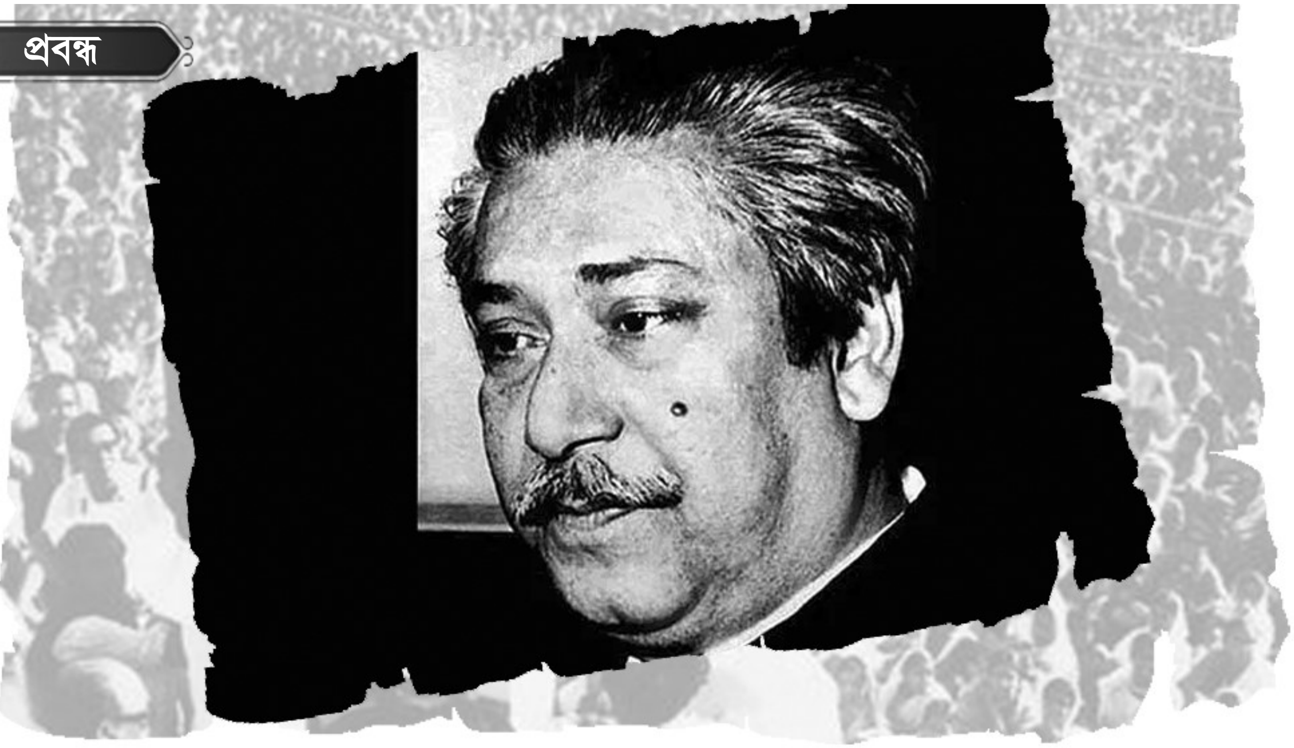

যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল

আলী হাবিব

তিনি জাতির পিতা। তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি। তিনি বঙ্গবন্ধু। তিনি সেই পুরুষ, যাঁর কথা উল্লেখ করেছেন শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায়। তিনি তো আসলেই 'সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীর সাঁতার পানি থেকে উঠে আসা, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা' কিংবা 'রং-বেরঙের পাখি ওড়াতে ওড়াতে হৈমন্তিক বিল থেকে প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মতো উপত্যকায় উঠে আসা' মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।' তিনি তো সেই মানুষ। ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বমানব। তাঁর আদর্শের আন্তরিক আহ্বান, নির্দেশনা মেনে সাড়া দিয়েছে এ দেশের মানুষ। এনেছে পূর্ণতা, স্বাধীনতায়।

বাঙালির দেবদূত তিনি। দিয়ে গেছেন একটি জাতিরাষ্ট্র ও ভাষারাষ্ট্র। আমাদের পরিচয় সংকট থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদের হীনম্মন্যতা, জাতিসত্তার সংকট, ভাষার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করেছেন তিনি।

প্রথম যৌবনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, এরপর পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, ধাপে ধাপে বাঙালির মুক্তির নানা আন্দোলন করেছেন বঙ্গবন্ধু। ধীরে ধীরে বাঙালিকে প্রস্তুত করেছেন, জাগিয়ে তুলেছেন স্বাধীনতার জন্য। বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের অনিবার্য ফল একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল বিজয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালিকে দিয়েছেন ভাষা ও জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশ।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তাঁর জন্ম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর 'শেখ মুজিব আমার পিতা' নিবন্ধে লিখেছেন, 'বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সেই গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া।...এখানেই জন্ম নেন আমার বাবা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার বাবার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার বাবার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান।...অন্যায়কে তিনি কোনো দিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি।'

বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে আমরা তাঁর জেলজীবনের জন্মদিনের কথা জানতে পাই। ১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ শুক্রবার তিনি লিখেছেন, "আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করিনি–বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয় আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। 'আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস!' দেখে হাসলাম। মাত্র ১৪ তারিখে রেণু ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দেখতে এসেছিল। আবার এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে অনুমতি কি দেবে? মন বলছিল, যদি আমার ছেলে-মেয়েরা ও রেণু আসত ভালোই হতো। ১৫ তারিখেও রেণু এসেছিল জেলগেটে মণির সঙ্গে দেখা করতে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি নূরে আলম–আমার কাছে ২০ সেলে থাকে, কয়েকটা ফুল নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত। আমাকে বলল, এই আমার উপহার, আপনার জন্মদিনে। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। তারপর বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার একটা রক্তগোলাপ এবং বাবু সুধাংশু বিমল দত্তও একটি সাদা গোলাপ এবং ডিপিআর বন্দি এমদাদুল্লা সাহেব একটা লাল ডালিয়া আমাকে উপহার দিলেন।

আমি থাকি দেওয়ানি ওয়ার্ডে, আর এঁরা থাকেন পুরোনো ২০ সেলে। মাঝেমধ্যে দেখা হয় আমি যখন বেড়াই আর তাঁরা যখন হাঁটাচলা করেন স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য।

খবরের কাগজ পড়া শেষ করতে ৪টা বেজে গেল।

ভাবলাম 'দেখা' আসতেও পারে।...তখন সাড়ে ৪টা বেজে গেছে, বুঝলাম আজ বোধ হয় রেণু ও ছেলে-মেয়েরা দেখা করার অনুমতি পায়নি। ৫টাও বেজে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জমাদার সাহেব বললেন, চলুন, আপনার বেগম সাহেবা ও ছেলে-মেয়েরা এসেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে রওয়ানা করলাম জেলগেটের দিকে। ছোট মেয়েটা আর আড়াই বছরের ছেলে রাসেল ফুলের মালা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। মালাটা নিয়ে রাসেলকে পরিয়ে দিলাম। সে কিছুতেই পরবে না, আমার গলায় দিয়ে দিল। ওকে নিয়ে আমি ঢুকলাম রুমে। ছেলে-মেয়েদের চুমো দিলাম। দেখি সিটি আওয়ামী লীগ একটা বিরাট কেক পাঠিয়ে দিয়েছে। রাসেলকে দিয়েই কাটালাম, আমিও হাত দিলাম। জেলগেটের সবাইকে কিছু কিছু দেওয়া হলো। কিছুটা আমার ভাগ্নে মণিকে পাঠাতে বলে দিলাম জেলগেটে থেকে।...

৬টা বেজে গেছে, তাড়াতাড়ি রেণুকে ও ছেলে-মেয়েদের বিদায় দিতে হলো। রাসেলও বুঝতে আরম্ভ করেছে, এখন আর আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। আমার ছোট মেয়েটা খুব ব্যথা পায় আমাকে ছেড়ে যেতে, ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি। ব্যথা আমিও পাই, কিন্তু উপায় নেই। রেণুও বড় চাপা, মুখে কিছুই প্রকাশ করে না। ফিরে এলাম আমার আস্তানায়। ঘরে ঢুকলাম, তালা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। ভোরবেলা খুলবে।"

তাঁর কর্মপ্রবাহের স্মারক স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র এক বছর তিন মাসের মাথায় তিনি দেশে একটি সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯৭২ সালেই জাতিকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রভিত্তিক এমন একটি সংবিধান উপহার দিয়েছেন, যাকে এখনো একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ছয় দফা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকার পল্টনের মাঠে বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তান নয়, এই অঞ্চলের নাম বাংলাদেশ। আমাদের পরিচয় বাঙালি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগ-যুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যেসব দেশবাসী অতীতকালের তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয়নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান, বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র, মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা শুধু আপন দেশকে নয়, পুরো পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সব মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে; সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই মানুষ, যাঁর 'আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল'। তিনি দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর শামসুর রাহমানের কবিতায় আমরা তো সেই মানুষকেই পাই, 'যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল, গান হয়ে নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা;' তাঁর নামের ওপর 'কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া।' তাঁর নামের ওপর 'পাখা মেলে দেয় জ্যোৎস্নার সারস'।

আজ সেই মহানায়কের জন্মদিন, 'যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা, ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর ঝরে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।'

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

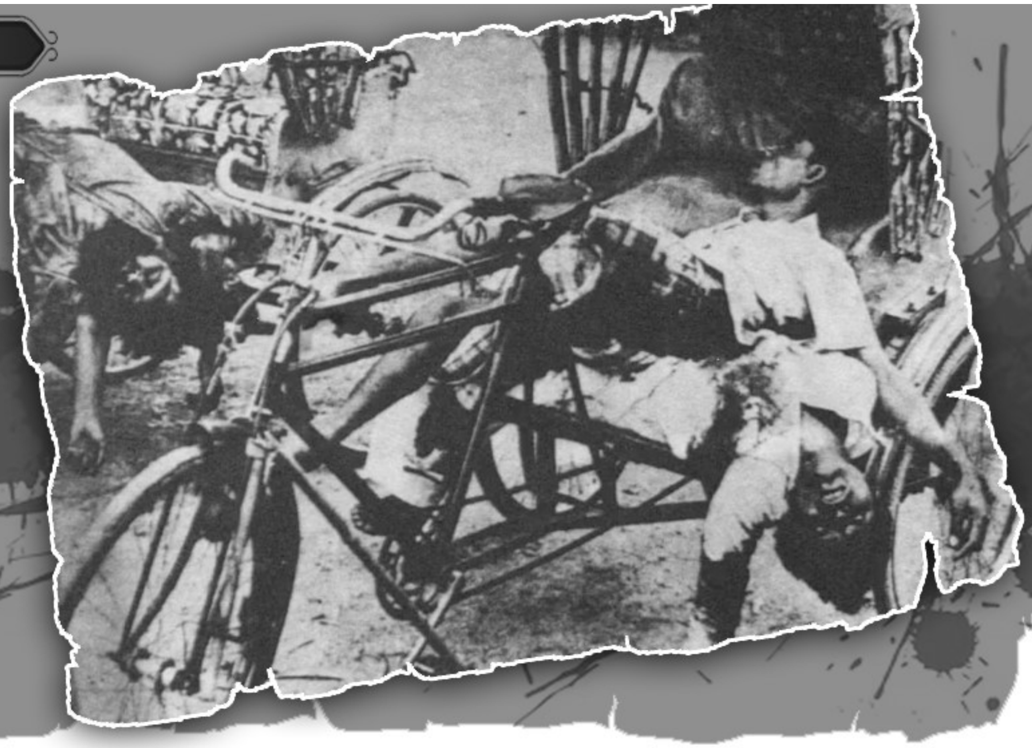

পঁচিশে মার্চের স্মৃতি

তোফায়েল আহমেদ

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। বাইশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে সাবেক বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে বৈঠকে কর্নেল এমএজি ওসমানী সাহেব (মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি) বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ডু ইউ থিংক দ্যাট টুমরো উইল বি এ ক্রুশিয়াল ডে?' বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেন, 'নো, আই থিংক, ইট উইল বি টুয়েন্টি ফিফথ।' তখন ওসমানী সাহেব পুনরায় তীক্ষ্ণ স্বরে তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'কাল তো তেইশে মার্চ। পাকিস্তান দিবস। সে উপলক্ষ্যে ওরা কি কিছু করতে চাইবে না?' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ওরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু করতে পারে। তার জন্য কোনো দিবসের প্রয়োজন হয় না।' কী নিখুঁত হিসাব বঙ্গবন্ধুর। হিসাব করেই তিনি বলেছিলেন, পঁচিশে মার্চেই পাকিস্তানিরা ক্র্যাকডাউন করবে।

মধ্য মার্চে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যখন বঙ্গবন্ধুর সংলাপ চলে, তখন আমাদের চারজনকে, যারা আমরা পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে মুজিববাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছি–মণি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই এবং আমাকে প্রতিরাতেই ব্রিফ করতেন যে কী হয়েছে, কী ঘটছে এবং কী হতে চলেছে। তিনি কখনোই মনে করেননি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তিনি বলেছিলেন, 'ইয়াহিয়া খানের সময় দরকার, আমারও সময় দরকার। তোমরা প্রস্তুতি নাও। আমি আক্রান্ত হব। কিন্তু আক্রমণকারী হব না। যখনই ওরা আক্রমণ করবে এবং আমরা আক্রান্ত হব, তখনই পৃথিবীর মানুষ বুঝবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প ছিল না।'

তেইশে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। সেদিন পাকিস্তানের পতাকা কোথাও ওড়েনি, শুধু ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া। আসগর খান তার বইয়ে লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান সফরে গিয়ে আমি

অবাক হয়েছি। কারণ, পাকিস্তানের চিহ্ন আমি পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও দেখিনি। শুধু ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া।' ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা শুরুর আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকে আসগর খান জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এরপর কী হতে পারে?' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইয়াহিয়া খান আসবে। তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদ আসবে। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এমএম আহমেদ আসবে। তার সঙ্গে বিচারপতি কর্নেলিয়াস আসবে। আরও কিছু লোক আসবে এবং এসে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু এ আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না। একদিন সে বাঙালি জাতির ওপর আক্রমণ করবে এবং সেদিনই পাকিস্তানের সমাধি রচিত হবে।' তেইশে মার্চ আমরা বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি।

আমার স্মৃতির পাতায় একাত্তরের ভয়াল পঁচিশে মার্চের গণহত্যার কথা মনে পড়ে। পঁচিশে মার্চ বহুলোক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসেছেন। অনেকেই অনুরোধ করে বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু, ৩২ নম্বরের বাসভবন ত্যাগ করেন।' বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'ওরা যদি আমাকে না পায়, ঢাকা শহরকে ওরা তছনছ করবে। লাখ লাখ লোককে ওরা হত্যা করবে। আমি তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমি এভাবে অন্য জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারি না। আমি আমার বাড়িতেই থাকব। কারণ, আমি আমার জীবন বাংলার মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছি। জীবন এবং মৃত্যু একসাথে। আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মৃত্যুকে বারবার আলিঙ্গন জানিয়েছি। এবারও আমি এখানেই থাকব। আমার দেশ যে স্বাধীন হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই।' বঙ্গবন্ধু সবার শুভ কামনা করে বিদায় জানিয়ে বলেছেন, 'তোমরা যাও, আমার যা করার আমি করেছি।' আমার মনে আছে ২৫ তারিখ তিনি বলেছিলেন, 'সত্যিই আমার জীবন সার্থক। আমি যা চেয়েছিলাম আজ তাই হতে চলেছে। এই তো প্রথম বাঙালিরা বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পেরেছে। আজ আমার কথামতো, আমার নির্দেশিত পথে বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে। আজ আমি যা বলি, মানুষ তা পালন করে। আমার অসহযোগ আন্দোলন সার্থক ও সফল হয়েছে।' আমরা যখন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম, ওরা তো আপনাকে গ্রেফতার করবে। আপনাকে হত্যাও করতে পারে। উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমাকে গ্রেফতার করে, হত্যা করে ওদের লাভ হবে না। ওরা আগেও আমাকে গ্রেফতার করেছিল। ওদের লাভ হয় নাই। এবারও আমাকে গ্রেফতার করুক, হত্যা করুক ওদের লাভ হবে না। আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। আমার মৃত্যুর পরে কেউ যদি আমার মৃতদেহ দেখে, দেখবে আমার মুখে হাসি। আমার জীবন সার্থক। কারণ, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হতে চলেছে।' মণি ভাই ও আমি সবশেষে রাত ১১টায় বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। তিনি আমাদের দুজনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। কোথায় গেলে অর্থ ও সাহায্য পাব সেসব কথা বলে আমাদের কপালে চুমু দিয়ে সে রাতে বিদায় দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। সেগুনবাগিচার একটি প্রেসে মণি ভাই লিফলেট ছাপাতে দিয়েছিলেন। সেগুনবাগিচা গেলাম। আমরা হেঁটে মণি ভাইয়ের বাসায় গেলাম। এরপর রাত ১২টায় জিরো আওয়ারে 'অপারেশন সার্চলাইট' নীলনকশা অনুযায়ী শুরু হয় ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা নগরীর নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামানের গোলা, মর্টারের শেল আর মেশিনগানের ভয়াল গর্জনে রাত ১২টার পর পুরো নগরীই জাহান্নামে পরিণত হয়। চারদিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে ইতিহাসের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। শুরু হয় বাঙালি নিধনে গণহত্যা। চারদিকে শুধু বিকট আওয়াজ। এক রাতেই লক্ষাধিক নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি বাহিনী। রাতে ওখানেই ছিলাম আমরা।

২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া খান বলেন, 'শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুজিব ইজ এ ট্রেইটর। দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিশড।' বক্তৃতায় তিনি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, 'আওয়ামী লীগকে আরও আগেই আমার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত ছিল। এদের নেতাদের আগেই আমার গ্রেফতার করা উচিত ছিল।'

পরদিন ২৭ মার্চে ২ ঘণ্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার হলে আমরা ঢাকা থেকে কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা বোরহানউদ্দিন গগনের (যিনি পরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন) বাড়িতে আশ্রয় নিই। কেরানীগঞ্জে দুই রাত থাকার পর ২৯ মার্চ মণি ভাই, জাতীয় নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান সাহেব এবং আমাদের বন্ধু সত্তরে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডা. আবু হেনা (যিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে পথে কলকাতা গিয়েছিলেন এবং এসেছিলেন)-সহ সেই পথে আমরা প্রথমে দোহার-নবাবগঞ্জ, পরে মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া হয়ে বালুঘাট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে ৪ এপ্রিল ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করি।

মার্চের ২৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বর কালপর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি নিধনে ৯ মাসব্যাপী বর্বর গণহত্যা পরিচালনা করে। 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নীলনকশায় ঢাকার চারটি স্থান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস এবং তৎকালীন পিলখানা ইপিআর (বর্তমান বিজিবি)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার

> আমি আমার জীবন বাংলার মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছি। জীবন এবং মৃত্যু একসাথে। আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মৃত্যুকে বারবার আলিঙ্গন জানিয়েছি। এবারও আমি এখানেই থাকব। আমার দেশ যে স্বাধীন হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দসহ ইকবাল হলের (বর্তমানে শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্রলীগ নেতা চিশতী হেলালুর রহমান ও জাফর আলমকে হত্যা করে। এছাড়া জগন্নাথ হলের অনেক ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ঢাকার ৪টি স্থান ছাড়াও রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম ছিল ‘অপারেশন সার্চলাইট’-এর আওতাভুক্ত এলাকা।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষাধিক মানুষ যে শহিদ হয়েছে, তার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে তৎকালে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলো। অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা হেরাল্ড ট্রিবিউনের রিপোর্ট অনুসারে পঁচিশে মার্চ রাতে শুধু ঢাকা শহরেই ১ লাখ লোককে হত্যা করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতের শরণার্থীশিবিরগুলো পরিদর্শন করেন ১৯৭১ সালে। তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করেন। ‘গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’-এ বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিশ শতকের পাঁচটি ভয়ংকর গণহত্যার অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘টাইম’ ম্যাগাজিনের ড্যান কগিন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক, একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'We can kill anyone for anything. We are accountable to no one.' বিশ্বখ্যাত এ পত্রিকাটির একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল, 'It is the most incredible, calculated thing since the days of the Nazis in Poland.' আন্তর্জাতিক মহলের মতে, একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ‘তিন মিলিয়ন’ বা ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। এই সংখ্যার সমর্থন রয়েছে Encyclopedia Americana এবং National Geographic Magazine-এ। এসব রিপোর্টে লেখা আছে, বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডে নাজি বাহিনীর বর্বরতার চেয়েও ভয়াবহ। এ গণহত্যা সম্পর্কে পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী তার ডায়ারিতে লিখেছেন, 'paint the green of East Pakistan red'. অর্থাৎ তিনি বাংলার সবুজ মাঠকে লাল করে দেবেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হেরাল্ড ট্রিবিউন একাত্তরের ১ জুন লিখেছে, ‘পাকিস্তানের গণহত্যা থেকে রেহাই পেতে লাখ লাখ উদ্বাস্তু মুসলমান এবং অন্যরা স্রোতের মতো ভারতে চলে আসছে।’ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাস পর ২৬ এপ্রিল নিউজউইক লিখছে, ‘ইসলামাবাদ হাইকমান্ডের নির্দেশে সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং নেতৃত্ব প্রদানে সম্ভাবনাময় এমন সব লোককে পাইকারি হারে হত্যা করছে।’ রবার্ট পেইন তার 'Massacre' গ্রন্থে ইয়াহিয়া খানকে উদ্ধৃত করে লেখেন, 'Kill three million of them and the rest will eat out of our hands.' একাশিতে জাতিসংঘের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, 'Among the genocides of human history, the highest number of people killed in lower span of time is in Bangladesh in 1971. An average of 6000 (six thousand) to 12000 (twelve thousand) people were killed every single day. …This is the highest daily average in the history of genocides.' এমনকি মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশে গণহত্যা তদন্তে পাকিস্তানে যে ‘হামুদুর রহমান কমিশন’ গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশন তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশে গণহত্যার কথা স্বীকার করে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কথা বলেছে।

পৃথিবীতে অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু এভাবে রক্ত দিয়ে একজন নেতার নেতৃত্বে সমস্ত বাঙালি জাতি এক কাতারে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষাধিক প্রাণ আর ২ লক্ষাধিক মা-বোনের সুমহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে ৯ মাসে মহান বিজয় অর্জন মানবজাতির ইতিহাসের নজিরবিহীন ঘটনাই বটে!

লেখক: সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
সদস্য, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

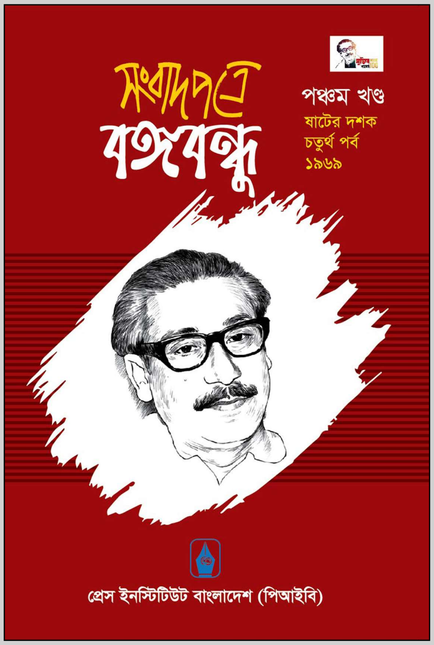

পিআইবি’র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

১৯ মার্চ ১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক

ঐতিহাসিক ১৯ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গাজীপুরের (সেই সময়ের জয়দেবপুর) বীর জনতা গর্জে উঠেছিল এবং সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোয় বাঙালি জাতির এক অবিস্মরণীয় গণ-অভ্যুত্থানের কথা।

১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ দুপুরে হঠাৎ এক বেতার ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। এ কথা শোনামাত্রই সারা দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে ঘোষণার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। দেশের সর্বত্রই স্লোগান ওঠে–‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ‘পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা-বাংলা’, ‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’, ‘তুমি কে আমি কে, বাঙালি-বাঙালি’।

বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পূর্বাণী হোটেলে এক সভায় ইয়াহিয়ার ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঢাকায় ২রা মার্চ এবং সারা দেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ৩রা মার্চ হরতাল আহ্বান করেন এবং ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা আহ্বান করেন।

জয়দেবপুরে (আজকের গাজীপুর) আমার পরামর্শে ২রা মার্চ রাতে তৎকালীন থানা পশুপালন কর্মকর্তা আহম্মেদ ফজলুর রহমানের সরকারি বাসায় তৎকালীন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিব উল্ল্যাহ এক সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। সভায় আমাকে (আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক) আহ্বায়ক করে এবং মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরির শ্রমিকনেতা

নজরুল ইসলাম খানকে কোষাধ্যক্ষ করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সদস্য হন আয়েশ উদ্দিন, মো. নুরুল ইসলাম (ভাওয়ালরত্ন), মো. আ. ছাত্তার মিয়া (চৌরাস্তা), থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম হজরত আলী মাস্টার (চৌরাস্তা), মো. শহীদ উল্ল্যাহ বাচ্চু (মরহুম), হারুন-অর-রশিদ ভূঁইয়া (মরহুম), শহিদুল ইসলাম পাঠান জিন্নাহ (মরহুম), শেখ আবুল হোসেন (শ্রমিক লীগ) ও থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা. সাঈদ বকস্ ভূঁইয়া (মরহুম)। কমিটির হাইকমান্ড (উপদেষ্টা) হন মো. হাবিব উল্ল্যাহ (মরহুম), শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা এম. এ. মুত্তালিব এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নেতা বাবু মনিন্দ্রনাথ গোস্বামী (মরহুম)।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার আগেই আমরা এ কমিটি গঠন করেছিলাম। পেছনের ইতিহাস এই যে, আমি ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। নিউক্লিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, যা মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬২ সালেই ছাত্রলীগের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যেই সশস্ত্র যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যেও নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। যার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে পাকিস্তানিদের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের দায়ের করা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' মামলায়, যা বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত।

স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই বুঝতে পেরেছিলাম, সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। জয়দেবপুরে (গাজীপুরে) সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ গাজীপুর স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশের বটতলায় এক সমাবেশ করে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্লোগান ওঠে, 'ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। পতাকা ধরেছিলেন হারুন ভূঁইয়া এবং অগ্নিসংযোগ করেছিলেন শহীদ উল্ল্যাহ বাচ্চু আর স্লোগান মাস্টার আ. ছাত্তার মিয়া পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে স্লোগান দিত।

আমরা ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী (তৎকালীন রেসকোর্স) উদ্যানে সেসময় জয়দেবপুর (গাজীপুর) থেকে হাজার হাজার বীর জনতা ট্রেনে করে এবং শতাধিক ট্রাক ও বাসে করে মাথায় লাল ফিতা বেঁধে জনসভায় যোগ দিলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজ ভাবতেও অবাক লাগে, কীভাবে এ জনস্রোত এসে মিশে গিয়েছিল ৭ই মার্চের মহাসমুদ্রে।

৭ই মার্চে উজ্জীবিত হয়ে আমরা সম্ভবত ১১ মার্চ গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি) আক্রমণ করি। গেটে বাধা দিলে আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছি মাইকে। পাকিস্তানিদের বুঝতে পারার জন্য ইংরেজিতে বলি, 'I do hereby dismiss Brigadier Karimullah from the directorship of Pakistan Ordnance Factory and do hereby appoint Administrative officer Mr Abudul Qader (বাঙালি) as the director of the ordnance Factory'।

এই গর্জনে সত্যি কাজ হয়েছিল। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার বক্তৃতা চলাকালীনই পেছনের গেট দিয়ে সালনা হয়ে পালিয়ে ঢাকা চলে আসেন। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আর পরবর্তীকালে ১৫ই এপ্রিলের আগে গাজীপুরে যাননি। পাকিস্তান সমরাস্ত্র কারখানা ২৭শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের দখলেই ছিল। সম্ভবত ১৩ই মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী জয়দেবপুর রাজবাড়ী মাঠে হেলিকপ্টারে অবতরণ করতে চেষ্টা করলে শত শত বীর জনতা হেলিকপ্টারের প্রতি ইটপাটকেল ও জুতা ছুড়তে শুরু করলে হেলিকপ্টার না নামতে পেরে ফেরত চলে যায়।

সেদিন ১৭ই মার্চ বুধবার, মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে লাখ লাখ জনতার ঢল নেমেছিল ৩২ নম্বরের বাড়িতে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে। তৎকালীন আমাদের নির্বাচনি এলাকার এম. এন. এ. শামসুল হক (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য), হাবিব উল্ল্যাহসহ আমি গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুকে জয়দেবপুরে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার সংবাদ দিতে। সন্ধ্যায় আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পেয়ে কিছু বলতে চাই কি না বঙ্গবন্ধু জানতে চান। কুর্মিটোলা (ঢাকা) ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্রের মজুত কমে গেছে অজুহাতে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে রক্ষিত অস্ত্র আনার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংবাদ জানাই। শামসুল হক সাহেবের ইশারায় আমি তরুণ হিসাবে এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয় জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু ব্যাঘ্রের মতো গর্জে উঠে বললেন, 'তুই একটা আহাম্মক, কী শিখেছিস যে আমাকে বলে দিতে হবে!' একটু পায়চারি করে বলেন, 'বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে দেওয়া যাবে না। Resist at the cost of anything'।

নেতার হুকুম পেয়ে গেলাম। ১৯শে মার্চ শুক্রবার আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানি রেজিমেন্ট জয়দেবপুরস্থ (গাজীপুর) দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য পৌঁছে যায়। একজন জেসিও (নায়েব সুবেদার) জয়দেবপুর হাইস্কুলের মুসলিম হোস্টেলের পুকুরে (জকি স্মৃতি প্রাইমারি স্কুলের সামনে) গোসল করার সময় জানান, ঢাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চলে এসেছে। খবর পেয়ে দ্রুত আমাদের তখনকার আবাসস্থান মুসলিম হোস্টেলে ফিরে গিয়ে উপস্থিত হাবিব উল্ল্যাহ ও শহীদ উল্ল্যাহ বাচ্চুকে এ সংবাদ জানাই। শহীদ উল্ল্যাহ বাচ্চু তখনই রিকশায় চড়ে শিমুলতলীতে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট ও সমরাস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসার খবর দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে মাঠেই হাজার শ্রমিক জনতা চারদিক থেকে লাঠিসোঁটা, দা, কাতরা, ছেন, দোনলা বন্দুকসহ জয়দেবপুর উপস্থিত হয়।

সেদিন জয়দেবপুর হাটের দিন ছিল। জয়দেবপুর রেলগেটে মালগাড়ির বগি, রেলের অকেজো রেললাইন, স্লিপারসহ বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি, কাঠ, বাঁশ, ইট ইত্যাদি যে যেভাবে পেরেছে, তা দিয়ে এক বিশাল ব্যারিকেড দেওয়া হয়। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত আরও পাঁচটি ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে ফেরত যেতে না পারে।

২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (পরবর্তীকালে সেনাপ্রধান)। আমরা যখন ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম, তখন টাঙ্গাইল থেকে রেশন নিয়ে একটি কনভয় জয়দেবপুর আসছিল। সেই রেশনের গাড়িকে জনতা আটকে দেয়। সেই কনভয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্যের চায়নিজ রাইফেল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।

এদিকে রেলগেটের ব্যারিকেড সরানোর জন্য ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব কৌশল হিসাবে বাঙালি সৈন্যদের সামনে দিয়ে, পেছনে পাঞ্জাবি সৈন্যদের রেখে মেজর শফিউল্লাহকে জনতার ওপর গুলি বর্ষণের আদেশ দেয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা আমাদের/জনতার ওপর গুলি না করে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ে সামনে আসতে থাকলে আমরা বর্তমান গাজীপুর

কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওপর অবস্থান নিয়ে বন্দুক ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করি।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে শহিদ হন নেয়ামত ও মনু খলিফা। আহত হন চতরের সন্তোষ, ডা. ইউসুফসহ শত শত বীর জনতা। পাকিস্তানি বাহিনী কারফিউ জারি করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। আমরা পিছু হটলে দীর্ঘ সময় চেষ্টা করে ব্যারিকেড পরিষ্কার করে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চান্দনা চৌরাস্তায় এসে আবার প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হুরমত এক পাঞ্জাবি সৈন্যকে পেছন থেকে আক্রমণ করেন। আমরা সৈন্যের রাইফেল কেড়ে নিই। কিন্তু পেছনে আরেক পাঞ্জাবি সৈন্য হুরমতের মাথায় গুলি করলে হুরমত সেখানেই শাহাদতবরণ করেন। বর্তমানে সেই স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নামে ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে।

পরদিন বঙ্গবন্ধু আলোচনা চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে ১৯শে মার্চের নিহতের কথা উল্লেখ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান উল্লেখ করেন, জয়দেবপুরের জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আধুনিক অস্ত্র ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করেছে এবং এতে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

১৯শে মার্চের পর সারা দেশে স্লোগান ওঠে, 'জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জয়দেবপুরের পথ ধর, সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু কর'। ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ প্রথম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গাজীপুরবাসীর উদ্দেশে এক পত্রে ১৯শে মার্চের সশস্ত্র প্রতিরোধের সময় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জয়দেবপুরবাসীকে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

১৯শে মার্চের সশস্ত্র যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইলফলক। জয়দেবপুরের গৌরবগাথা উনিশে মার্চ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস হিসাবে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করার দাবিতে গাজীপুরের সর্বস্তরের জনতা আবেদন জানিয়ে আসছে। ১৯শে মার্চকে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস হিসাবে দেশব্যাপী জাতীয়ভাবে পালিত হলে মুক্তিযুদ্ধের সূচনার ইতিহাস যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে বলে আমি মনে করি।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
এবং মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

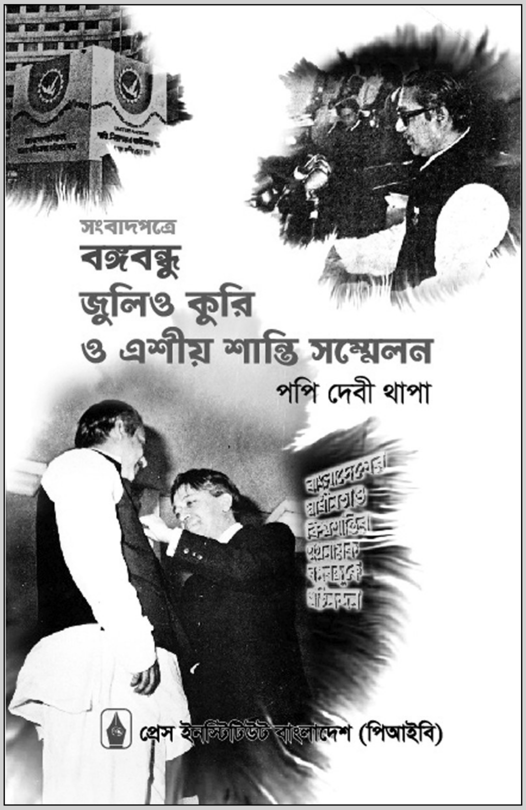

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

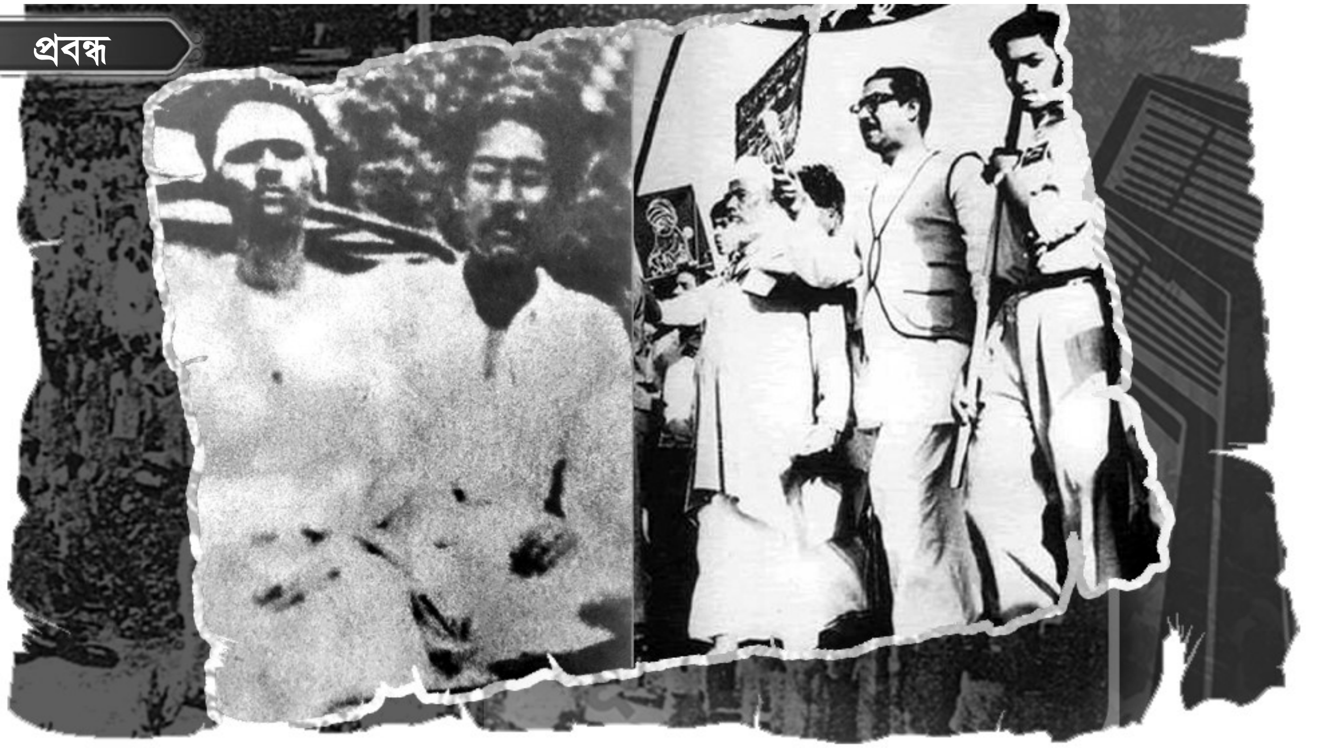

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু

বিপ্লব বড়ুয়া

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘আজও আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তা আসবে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে, চরম আশ্বাসের কথা শোনাবে পূর্ব দিগন্ত থেকেই।’

বাংলার ভাগ্যাকাশে সেই পরিত্রাণ কর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন-বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। পৃথিবীতে শুধু বাঙালি জাতিরই বিশেষ একটি বিশেষত্ব আছে, আর তা হলো বাঙালির মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা উভয়ই ‘বাংলা’। আবার দেশের নাম অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে ‘বাংলা’ শব্দটি জড়িয়ে আছে। ‘Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’-শীর্ষক গোয়েন্দা রিপোর্ট (যদিও অনেক রিপোর্ট পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নষ্ট করেছে) প্রকাশের পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও ভূমিকার কথা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতির পিতা শুধু বাঙালির স্বাধীনতা এনে দেননি, তিনি বাঙালির ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ছিলেন অগ্রগণ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব, অতঃপর রাষ্ট্রভাষার অধিকার আদায়, বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা

ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং স্বাধীনতার পরও বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মূলত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন করার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির আসল রূপ উন্মোচিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজ নিজেদের অধিকার রক্ষার চিন্তা করতে শুরু করে। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের একটি কক্ষে। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন–কাজী ইদ্রিস, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুল্লা কায়সার, রাজশাহীর আতাউর রহমান, আখলাকুর রহমানসহ আরও কয়েকজন। আলোচ্য বিষয়–পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের যুবসমাজের করণীয় কী?

এর কয়েকদিন আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু তারও আগে যখন পাকিস্তান সৃষ্টির কথাবার্তা চলছে, তখন বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালের ৭ জুলাই কলকাতার 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর এই দাবি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ৬-৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। এ সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাব পাঠ করেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।' (সূত্র: ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, গাজীউল হক; ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)

এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ভারত থেকে নিজের মাতৃভূমি তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তিনি অংশ নেন। সেই সময়ের তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বাংলা ভাষার দাবির সপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বদান করেন তিনি। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতাহার প্রণয়ন করেছিলেন। এ ইশতাহারের দ্বিতীয় দাবি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। ইশতাহারটি একটি ছোটো পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতেহার-ঐতিহাসিক দলিল'। পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্যদলিল হিসাবে স্বীকৃত। এই ইশতাহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। (রাষ্ট্রভাষা-২১ ইশতেহার: ঐতিহাসিক দলিল, শায়খুল বারী, পুনঃপ্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২)।

পাকিস্তান সৃষ্টির তিন-চার মাসের মধ্যেই পুস্তিকাটির প্রকাশনা ও প্রচার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের জন্য পাকিস্তান নামের স্বপ্ন-সম্পৃক্ত মোহভঙ্গের সূচনার প্রমাণ বহন করে। ১৯৪৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তমদ্দুন মজলিস প্রধান অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ হয়। এ মিছিলের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় শেখ মুজিব বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। শেখ মুজিবসহ সব প্রগতিবাদী ছাত্রনেতাই বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। তিনি সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আন্দোলনে শরিক হন। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগের যৌথ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। সভায় গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের বাংলা ভাষাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এতে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, ছাত্রাবাসগুলোর সংসদ প্রভৃতি ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানের দুজন করে প্রতিনিধি যোগদান করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। এ পরিষদ গঠনে বঙ্গবন্ধু সক্রিয় ছিলেন। ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে সরকারের সঙ্গে আঁতাতকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, সরকারের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠল, সরকার কি আপসের প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত সাহেব, শামসুল হক সাহেব। আপসকামীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন, 'সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছতেন, তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না' (সূত্র: 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫', অলি আহাদ)। ১১ মার্চ হরতাল হয়েছিল, পিকেটিং হয়েছিল সেক্রেটারিয়েটের সামনে, সেখান থেকে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম সফল হরতাল। এ হরতালে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেফতার হন। এ প্রসঙ্গে জাতির পিতা তাঁর লেখা 'কারাগারের রোজনামচা'য় (বাংলা একাডেমি-২০১৭ থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২০৬) লিখেছেন, 'প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (এখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ) ও তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে। ওইদিন ১০টায় আমি, শামসুল হক সাহেবসহ প্রায় ৭৫ ছাত্র গ্রেফতার হই এবং আবদুল ওয়াদুদসহ অনেকেই ভীষণভাবে আহত হয়ে গ্রেফতার হন।' ১১ মার্চের হরতাল সফল করতে প্রচারমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সই করেছিলেন। জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিবৃতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

> ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান

১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তদানীন্তন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে জেলখানায় আটক ভাষাসংগ্রামী ও রাজবন্দিদের চুক্তিটি দেখানো ও অনুমোদন নেওয়া হয়। অনুমোদনের পর চুক্তিটি সই হয়। কারাবন্দিদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তির শর্ত দেখেন এবং অনুমোদন দেন। এ ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং চুক্তির মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক শেখ মুজিব ও অন্য ভাষাসৈনিকরা কারামুক্ত হন।

এই চুক্তির ফলে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার দেশবাসীর কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল। ১৫ মার্চ আন্দোলনের কয়েকজন নেতৃত্বকে মুক্তিদানের ব্যাপারে সরকার গড়িমসি শুরু করে। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষিপ্ত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেন। ১৭ মার্চ দেশব্যাপী শিক্ষায়তনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ওই দিনের ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। শেখ মুজিব একজন বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা এবং অসম সাহসী যুবনেতা হিসাবে ছাত্রসমাজে ওই সময় থেকেই ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, আবদুল মতিন, শামসুল হক প্রমুখ যুবনেতার কঠোর সাধনার ফলে বাংলা ভাষার আন্দোলন সমগ্র পূর্ববাংলায় একটি গণ-আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কে যারা নিরলস কাজ করেছেন, সেই ছাত্রনেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম। শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পদত্যাগ করলে ক্ষমতার পালাবদলে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত প্রতিবছর 'ভাষা আন্দোলন দিবস' (১১ মার্চকে) হিসাবে পালন করা হয়।

১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। একই বছর জুলাইয়ের শেষে তিনি পুনরায় মুক্তি পান। ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে জনসভা শেষে বঙ্গবন্ধু ভুখা মিছিল বের করেন। ওই মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা-২০১৭, পৃ. ৫)। বেশ কিছুদিন পর বঙ্গবন্ধুকে জেলে আটকে রেখে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হককে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হকের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, '১৯৪৯ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার হওয়ার পর জেল থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিতেন।' ভাষাসৈনিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা প্রবন্ধে বলেছেন, 'শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন।' (সূত্রঃ একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক, ড. মোহাম্মদ হাননান, পৃ. ৫৩)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে জেলখানার সে ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, "আরও বললাম, 'খবর পেয়েছি, আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এসো।' আর দু-একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। শওকত মিয়া ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকেও দেখা করতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসলো। সেখানেই ঠিক হলো আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। এ দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। মহিউদ্দিন জেলে আছে, আমার কাছে থাকে। যদি সে অনশন করতে রাজি হয়, তবে খবর দেবো। তার নামটাও আমার নামের সাথে দিয়ে দিবে। আমাদের অনশনের নোটিশ দেওয়ার পরই শওকত মিয়া

প্যামপ্লেট ও পোস্টার ছাপিয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করে। শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদ ফরিদপুর জেলে তাদের মুক্তির দাবিতে অনশন করছেন। তারা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন।”

জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন (সূত্র: একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক, ড. মোহাম্মদ হাননান, পৃ. ৫৩)। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ‘সেসময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ওই বছর জুন মাসে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি।’ বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ ও অসীম রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন। ওই বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ২৯ জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৪৯-৫৩ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে থাকলেও ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে এই পত্রিকায় মওলানা ভাসানীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘বাংলা ভাষার পক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে মুজিব সক্ষম না হলে শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ত।’

বাংলার কোনো কোনো নেতা বাংলা ভাষার দাবির ব্যাপারে বিপক্ষে অবস্থান করলেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে তারাও ভাষার দাবি আদায়ে শামিল হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে কোনোভাবে হেলাফেলা না করার ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করে দেন। ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকেই বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে বাংলাও রাষ্ট্রীয় ভাষা হোক।’ এরপর ৭ ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে তিনি খসড়া শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে বলেছিলেন, ‘পূর্ববঙ্গে আমরা সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝি না। কাজেই খসড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভাষা সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা কুমতলবে করা হয়েছে।’ ১৬ ফেব্রুয়ারির আইনসভার অধিবেশনেও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। (সূত্র: ‘ভালোবাসি মাতৃভাষা’, ভাষা আন্দোলনের ৫০ পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্মারকগ্রন্থ, মার্চ ২০০২, পৃ. ১৮২-১৯১)

ভাষাসৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মতো দূরদর্শী নেতার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। বাংলা ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর্বে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু, সংসদের দৈনন্দিন কার্যাবলি বাংলায় চালু প্রসঙ্গে তিনি আইনসভায় গর্জে উঠেন এবং মহানায়কের ভূমিকা পালন করেন।

সেদিন সব আন্দোলন, মিছিল ও নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসাবে বঙ্গবন্ধু সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন।

পরবর্তী সময়েও তিনি বাংলা ভাষা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অধিকারের সেই একই দাবি ও কথাগুলো আরও বর্ধিত উচ্চারণে জাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। একমাত্র বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রথম সরকারি নির্দেশ জারি করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মূল নায়ক ও স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা আন্দোলনেরই সুদূরপ্রসারী ফল।’

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন, ভাষার চেতনাকে বুকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাচেতনায় ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি বিধানের সংকল্প”

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন, ভাষার চেতনাকে বুকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাচেতনায় ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি বিধানের সংকল্প। বাঙালিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ চেতনা ছিল সর্বদা সক্রিয়। এ ব্যাপারে তিনি আমৃত্যু ছিলেন আপসহীন, কঠোর। বাঙালি জাতি তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা কখনো ভুলবে না।

লেখক: ব্যারিস্টার; দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী

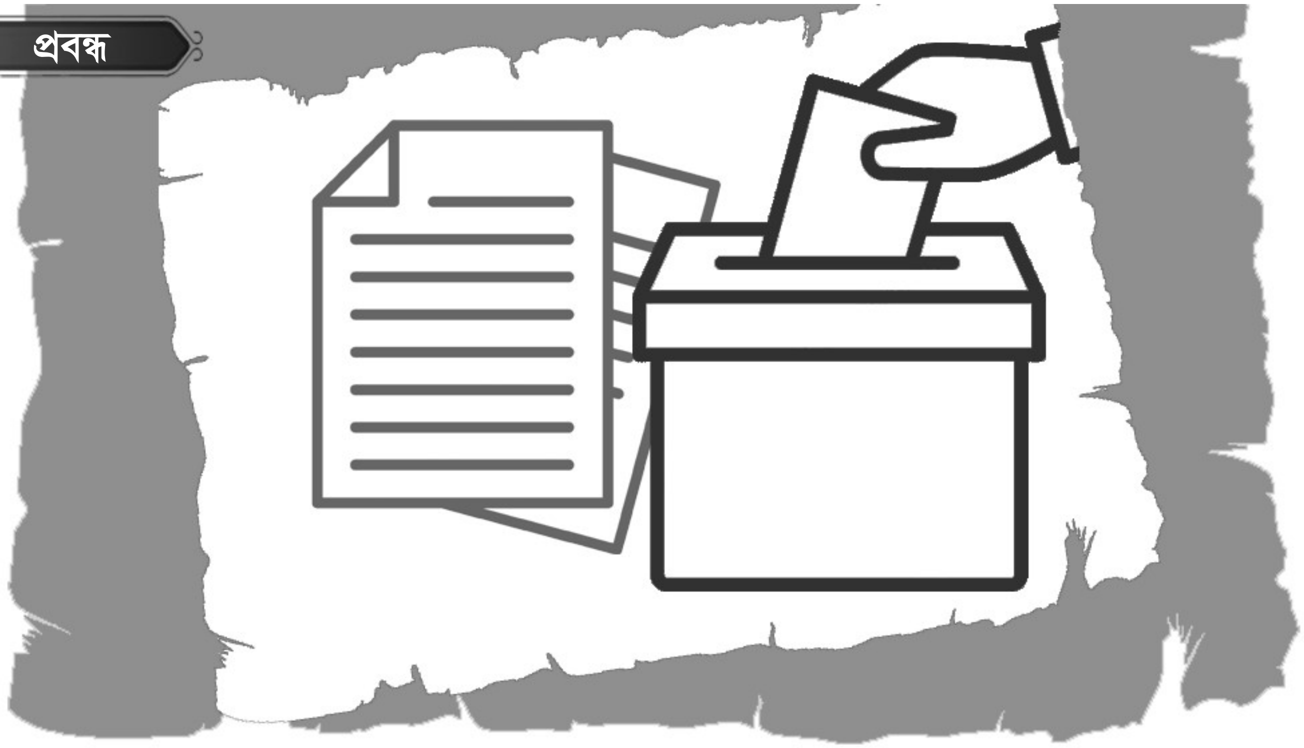

নির্বাচনি ইশতেহারের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

এটি সর্বজনবিদিত, যে কোনো জাতিরাষ্ট্রের সরকার পরিচালনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে জনমত বা জনসম্মতি। জনমতের ওপর ভিত্তি করেই দেশে সরকার গঠন, শাসন পরিচালনা, ক্ষমতায় আরোহণ-অপসারণসহ নতুন সরকার গঠিত হয়। সাধারণত যে কোনো বিষয়ে সমাজ-রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা হয়। কিন্তু সব মতামতই জনমত হিসাবে বিবেচ্য নয়। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো তাঁর লেখনীতে সর্বপ্রথম জনমত শব্দটি ব্যবহার করেন। বিশিষ্ট লেখক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইসসহ বিশিষ্ট গবেষকদের মতানুসারে, জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি বা সমাজের বিভিন্ন মতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য অনুসারে কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত। প্রাচীনকালে জনমতের কিছু ভূমিকা থাকলেও মতামত দেওয়ার অধিকারী জনগণের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আবার সে মতামত প্রকাশের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাও ছিল না। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে জনমত প্রত্যয়টি দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনায় বিশেষ করে রাজনীতিক ও সংবাদমাধ্যমে বহুলপ্রচারিত।

২০২৩ সালের ২৬ অক্টোবর গণমাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক জনমত জরিপে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৮ থেকে ১৬৬টি, বিএনপি ১১৯ থেকে ১৩৭টি এবং অন্যান্য দল ১৫টির মতো আসন পাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। সম্ভাব্য ফলাফলের

ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকার গঠনের সম্ভাবনা ছিল বেশি। আর বিএনপির পক্ষে এককভাবে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। 'ভোটারের মন বুঝে' ও আগের চারটি 'অপেক্ষাকৃত ভালো' নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণীত এ গবেষণার তথ্য উপস্থাপনে সংস্থাটির সভাপতি অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে কোন দলের অবস্থা কেমন হতে পারে, তা জাতীয় কৌতূহলের বিষয়। দোদুল্যমান ভোটারদের মন বুঝতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য ফলাফলে উপনীত হয়েছি।' গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে প্রধান অনুসিদ্ধান্ত ধারণ করেছেন; তা হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক। যেখানে সব দল-প্রার্থী ও ভোটারের জন্য নির্বাচনি মাঠ হবে সমান-সমতল। ফলে গবেষণায় নির্বাচনি কারসাজি, প্রহসন, জোরজবরদস্তি, টাকাপয়সার খেলা–এসব স্থান পায়নি। গবেষণায় আগের যে চারটি অপেক্ষাকৃত ভালো নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ১৯৯১, ১৯৯৬-এর জুন, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচন।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার ১১ কোটি ৯০ লাখ। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ ভোটারই দলের অনুগত। দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৫৫টি আসনের ফলাফল মোটামুটি অনুমেয়। এগুলো দলগুলোর জন্য সম্ভাব্য বিজয়ের প্রায় নিশ্চিত আসন। ফলাফল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকার গঠনের সম্ভাবনা বেশি। আর বিএনপির পক্ষে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিএনপির জোটবদ্ধ সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকলেও তা অনেক শর্তসাপেক্ষ। ওই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিজ্ঞজনের মতে, বিগত দেড় যুগে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন-অগ্রগতির দৃশ্যমান জনপথ, রেলপথ, সেতু, আশ্রয়ণ প্রকল্প, মডেল মসজিদ নির্মাণ; বিশেষ করে পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ, বে টার্মিনালসহ দেশের সামষ্টিক আর্থসামাজিক অগ্রগতির ধারাগুলো অবশ্যই বিবেচিত হবে। সামাজিক খাতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, কৃষক, শ্রমিক, আপামর ছাত্রজনতার জীবনপ্রবাহে ইতিবাচক পরিবর্তনে গৃহীত উদ্যোগগুলো ভোটারদের হৃদয়ে রেখাপাত করার প্রবল সম্ভাবনা অতিশয় কার্যকর।

২০২৩ সালের ৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চের 'ন্যাশনাল সার্ভে অব বাংলাদেশ, মার্চ-এপ্রিল ২০২৩' শীর্ষক জরিপ অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাজে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের সন্তুষ্টি প্রকাশের চিত্র উদ্ভাসিত। উল্লেখ্য, জরিপমতে, ২০১৮ সালের তুলনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা ৪ শতাংশ বেড়েছে। করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় সাফল্য শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া নানামুখী অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অব্যাহত বিস্তৃতকরণ প্রধানমন্ত্রীকে আরও জনপ্রিয় করে তুলছে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ জনসমর্থন ধরে রেখেছে। জরিপে অংশ নেওয়া উত্তরদাতারা বিভিন্ন খাতে শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সড়ক, মহাসড়ক এবং সেতু নির্মাণে সরকারের সাফল্যের কথা বলেছে ৮৭ শতাংশ মানুষ। ৯২ শতাংশ জানিয়েছে, আগামী জাতীয় নির্বাচনে তারা ভোট দিতে পারেন। ৪৪ শতাংশ মানুষ বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাইলেও বেশির ভাগ মনে করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই নির্বাচনে বিরোধীদের অংশ নেওয়া উচিত। উল্লেখ্য, গত বছর মার্চ ও এপ্রিলে দেশের ৬৪ জেলার পাঁচ হাজার ভোটারের সঙ্গে কথা বলে আইআরআই এ জরিপকার্য পরিচালনা করে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ হাজার ৩৪৮ জন ছিলেন ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের। ৩৬ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে ছিলেন ১ হাজার ৭৩৩ এবং ৫৬ বছরের ওপরে ছিলেন ৯১৯ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৬৩৩ ও ২ হাজার ৩৬৭ জন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ হাজার ৫৫০ জন শহরের এবং গ্রামের ৩ হাজার ৪৫০ জন।

দেশের সব মহল সম্যক অবগত আছে, নানামুখী সহিংসতা-অরাজকতা-নাশকতাকে পরিপূর্ণ অবজ্ঞা করেই কতিপয় বিরোধীদল বা জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ সত্ত্বেও ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর ঘোষিত হয়েছিল নির্বাচনি তপশিল। তপশিলে বর্ণিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন দল-জোটপ্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের বিষয়টি সম্পন্ন করেছিলেন। নিজ নিজ অঞ্চলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অত্যন্ত উঁচুমার্গের উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে মনোনয়নপত্র জমাদান দেশবাসীকে করেছিল অধিকমাত্রায় অনুপ্রাণিত। একদিকে দলের মনোনয়ন এবং অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমাদানের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের পূর্বাভাস ছিল অতিশয় অনুভূত। গণমাধ্যমে প্রকাশিত নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুসারে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৩০০টি আসনের বিপরীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বতন্ত্রসহ ২ হাজার ৭১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মধ্যে নিবন্ধিত ২৯টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ১ হাজার ৯৬৬ জন এবং ৭৪৭ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উল্লেখ্য, পরিসংখ্যান অনুসারে মোট প্রার্থীর এক-চতুর্থাংশই স্বতন্ত্র এবং প্রতি আসনে গড় প্রার্থীর সংখ্যা ৯ জন।

আমাদের সবার জানা, দেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দল গঠনের সব আনুষঙ্গিক পরিক্রমায় সুপ্রতিষ্ঠিত এই দল। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও কথিত বেসামরিক প্রহসন এবং বৈদেশিক নানামুখী বৈরী চাপে চরম নিষ্পেষিত এই দল পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে। মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত করে বাঙালির মুক্তির পদচারণায় আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল আকাশচুম্বী। বিশেষ করে ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন আন্দোলন, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাল-সবুজ পতাকার স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ছিল দেশের শতভাগ জনসমর্থিত একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল।

ধারাবাহিকভাবে তিন মেয়াদ সরকার পরিচালনায় এ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া দেশরত্ন শেখ হাসিনা। অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে নেওয়া বাংলাদেশকে করেছেন বিশ্বপরিমণ্ডলে উঁচুমাত্রিকতার আসনে অধিষ্ঠিত। উন্নয়নের মডেলখ্যাত বিশ্বস্বীকৃত বর্তমান বাংলাদেশ এবং দেশের জনগণ শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, মেধা-প্রজ্ঞা ও সুদূরপ্রসারী দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ পরিচয়ে ঋদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ। বিদায়ি খ্রিষ্টীয় বর্ষ ২০২৩ ছিল অব্যাহত

অভিযাত্রায় অর্জনের গৌরবে নিরন্তর উঁচুমাত্রিকতায় অত্যুজ্জ্বল। ২০২৩ সাল দেশব্যাপী বিভিন্ন মেগা প্রকল্প উদ্‌বোধনের বছর হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে এ বছরেই বাংলাদেশ টানেল যুগে প্রবেশ করে এবং বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়। বছরের শেষ দিনে পূর্ণতা পায় বিভিন্ন সময়ে আংশিক উদ্‌বোধন হওয়া ঢাকার মেট্রোরেল প্রকল্প। এছাড়াও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথ ও পদ্মা সেতুর দুই পাড়ের রেল সংযোগ দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় নতুন মাত্রিকতা সূচনা করেছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ৫০ বছরের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে উন্নয়নপরিক্রমা তথা আশু, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কার্যকরণ রোডম্যাপে অগ্রসরমান শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, লিঙ্গসমতা, দারিদ্র্যের হার হ্রাস, মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ু বৃদ্ধি, শ্রমঘন রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, বিশেষায়িত ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সমাজ গঠনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট দেশ হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। আগামী বছরগুলোয় দেশবাসীর কাছে করা আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রণিধানযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলো হলো রাষ্ট্র পরিচালনায় পবিত্র সংবিধানের প্রাধান্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন, সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো চেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা-অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার ধারা অব্যাহত থাকা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ-উদ্যোগী-তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর-দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক-জনকল্যাণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জনবান্ধব-স্মার্ট-আধুনিক বাহিনীতে রূপান্তর, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি চলমান রাখা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে ইউনিয়ন-উপজেলা-জেলা পরিষদসহ পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের সক্ষমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিসর আরও বৃদ্ধি করা, প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর

> জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত সময়ে দেওয়া নির্বাচনি ইশতেহারের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পদার্পণ করেছে

প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব উন্নয়ন, পোশাক ও ঔষধশিল্পকে রপ্তানিমুখীকরণ প্রভৃতি আজ দেশের আর্থসামাজিক দৃশ্যপটে যুগান্তকারী অভিধায় সমুজ্জ্বল। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় চালু হওয়া মডেল মসজিদ কাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো নীতি-নৈতিকতায় তারুণ্যের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে ধার্মিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার প্রজ্বালন ঘটাবেই–নিঃসন্দেহে তা প্রত্যাশিত।

জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত সময়ে দেওয়া নির্বাচনি ইশতাহারের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পদার্পণ করেছে। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ: উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান' স্লোগানে নতুন ইশতাহার ঘোষিত হয়েছে। সরকারের চলমান সাফল্যগাথার ভিত্তিতেই দ্বাদশ নির্বাচনের ইশতাহার অত্যন্ত আধুনিক-যুগোপযোগী ও ব্রতের সমাহার। ইশতাহারে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে চতুর্থ সুবিধার সম্প্রসারণ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমনের পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টা সচল রেখে তা নির্মূলে দক্ষিণ এশিয়া টাস্কফোর্স গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা অধিকমাত্রায় প্রশংসিত।

ওই ইশতাহারে সর্বাধিক প্রাধান্য পাওয়া ১১টি বিষয়ের মধ্যে ছিল দ্রব্যমূল্যের দাম কমিয়ে সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুরক্ষাচর্চার প্রসার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা-জবাবদিহি নিশ্চিত করা, আর্থিক খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিম্ন-আয়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করা, লাভজনক কৃষির লক্ষ্যে সমন্বিত কৃষিব্যবস্থা ও যান্ত্রিকীকরণ, দৃশ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা নিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে শিল্পের প্রসার ঘটানো, সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থায় সবাইকে সম্পৃক্তকরণ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সব ধরনের সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ রোধ করা ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা প্রভৃতি। এছাড়াও ইশতাহারে চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ২০২৮ সালের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা, জিডিপি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮ দশমিক ১ ও ১৬

শতাংশে উন্নীত করা, প্রবাসী আয় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে হতদরিদ্রের অবসান এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রায় সব দল-জোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষ থেকেও প্রায় একই ধরনের মতামত প্রকাশ করে ইশতাহার ঘোষিত হয়েছে। তুলনামূলক পর্যালোচনায় এটি প্রতিভাত যে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, অঞ্চল–নির্বিশেষে সবাই দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে জনকল্যাণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের উল্লেখ্য প্রতিশ্রুতি বাস্তব নিরীক্ষায় কোন পর্যায়ে কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবে, তা দেখা-অনুধাবনের বিষয় হয়ে থাকল।

সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূলের অঙ্গীকার শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বপরিমণ্ডলেও দেশের অবস্থান অধিক উঁচুমাত্রিকতায় অধিষ্ঠিত হবে। এই অঙ্গীকার দেশে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ-সম্প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিরোধ-বিচ্ছেদ সংহারের পরিবেশকে সুনিশ্চিত করে একটি আধুনিক মানবিক রাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা রাখবে–এটি সহজেই অনুমেয়। খাদ্য নিশ্চয়তা, দারিদ্র্য নির্মূল, শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সমুদ্রসম্পদ উন্নয়ন, জনবান্ধব প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নসহ সামগ্রিক সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার অবশ্যই দেশের আপামরসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে। ইশতাহারে বর্ণিত অন্যসব বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে অধিকতর অর্থবহ করার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দারুণ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে।

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার এবং বৈশ্বিক সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ধারাবাহিক অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিতে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার নতুন প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে মনে হয় করেছে অনেক বেশি উজ্জীবিত। এক বুক নতুন আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে অন্ধকারের সব অপশক্তিকে নির্ভীক সাহসিকতায় যথার্থ অর্থে নিধন করে কার্যকর অসাম্প্রদায়িক মানবিক রাষ্ট্র গঠনে প্রতিশ্রুতিগুলো পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের প্রত্যাশায় জনগণ গভীর আগ্রহে ৭ জানুয়ারি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের শানিত ও জাতির পিতার আদর্শিক চেতনায় সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় নতুন বিজয় অর্জন করে।

প্রত্যাশার পরিশিষ্ট দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যে দ্রুততার সঙ্গে ২১০০ ডেল্টা প্ল্যানের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন, রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ-প্রাণহানির মতো ঘটনা নিয়ন্ত্রণে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মীমাংসায় দলগুলোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, ত্যাগী-সৎ-যোগ্য ব্যক্তিত্বদের কোণঠাসা-অবমূল্যায়নের বিপরীতে যথার্থ মূল্যায়ন সাপেক্ষে পদপদবি-পদক প্রভৃতি নিশ্চিতকরণে নৈর্ব্যক্তিক-বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি-মূল্যস্ফীতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ লাঘবে বিদ্যমান সব সংকট চিহ্নিত ও পরিত্রাণের উপায় নির্ধারণ, দ্রুততম সময়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সন্ত্রাস-দুর্নীতি-অনিয়ম দূরীকরণে দল-সরকার-আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সব প্রতিষ্ঠানের আত্মশুদ্ধীকরণ, ছদ্মবেশে পরাজিত শক্তির আত্তীকরণ রোধে অনুপ্রবেশকারী-ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীদের সব অপকৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে যথার্থ অর্থেই দেশকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক চেতনার প্রকৃত পরিশুদ্ধ কর্মপন্থা অনুসন্ধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইতিবাচক সব উদ্যোগকে অধিকতর উদ্যমী ও নির্ভীক রূপ পরিগ্রহে সময়োপযোগী সহায়ক করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাবেক উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

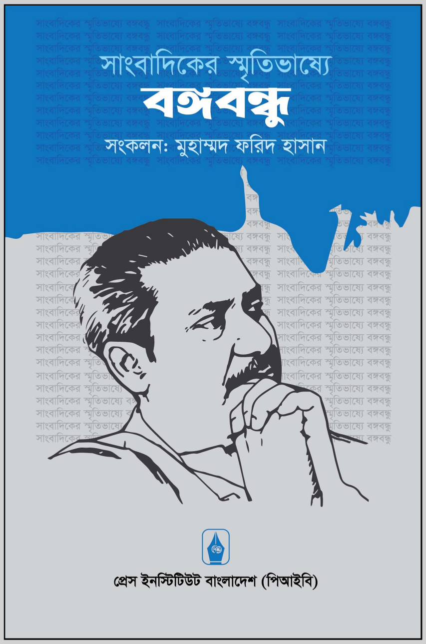

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

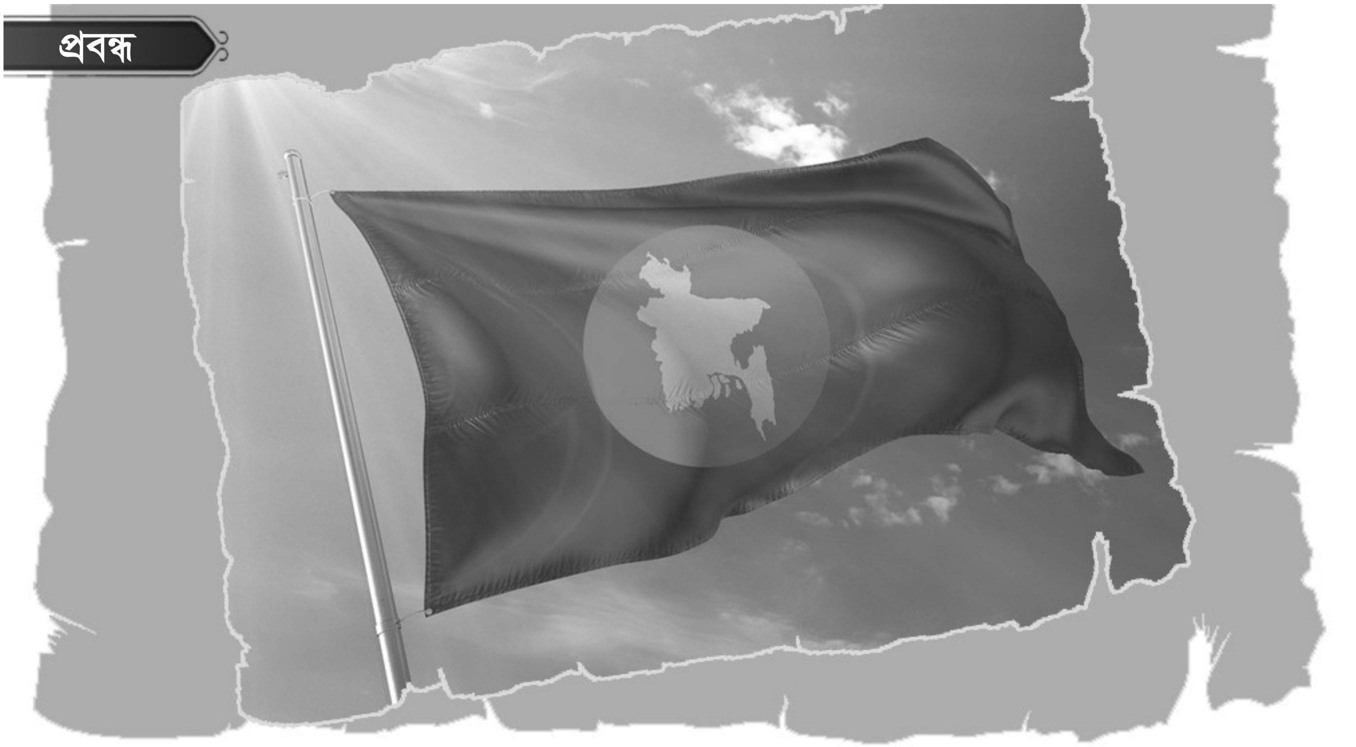

একটি পতাকার লাগি

কাওসার চৌধুরী

মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সাত্তার শিকদার। সংক্ষেপে সবাই সাত্তার শিকদার বলেই ডাকেন। খুলনার গল্লামারী খালপাড়ে তাঁর নিবাস। দেখতে-শুনতে অসম্ভব শক্তিশালী একজন মানুষ। প্রশস্ত বুক, শক্ত দুটি বাহু। বয়স ষাটের কাছাকাছি (১৯৯৭ সালে)।

১৯৯৭ সালে আমরা খুলনায় গিয়েছিলাম একটি প্রামাণ্যচিত্রের চিত্রধারণ করতে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে খুলনার গল্লামারী খালপাড়ে যে স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে, এর বেদিতে বসে কথা হচ্ছিল সাত্তার শিকদারের সঙ্গে। একটি-দুটি প্রশ্ন করতেই সাত্তার শিকদার এক লহমায় চলে গেলেন সেই একাত্তরে। নিজেই বলতে শুরু করলেন একাত্তরের কথা, “বয়স তখন আর কতই বা অইবো, তিরিশের কাছাকাছি। বউয়ের কাছে দুইটা বাচ্চা রাইখা চইলা গেলাম যুদ্ধে। দিনের পর দিন খাইয়া-না-খাইয়া যুদ্ধ করছি, খারাপ লাগে নাই কোনোদিন! কমান্ডার যেখানে থাকত কইছে, থাকছি। গোয়ালঘরে রাত কাটাইছি কতদিন! গোরুর গোবর খেড় (খড়) প্যাঁচাইয়া মাথার নিচে বালিশ বানাইছি। খেড়ের বালিশে মাথা রাইখা পাশে শুইয়া রইছে কমান্ডার টুকু ভাই (কামরুজ্জামান টুকু), কাইয়ুম ভাইসহ আরও কয়েকজন। হারা (সারা) রাইত খালি ‘চাইট মারি’ (এপাশ-ওপাশ করি)। কীসের নিদ্রা, কীসের ঘুম? টুকু ভাই জিগায়–কী হইছে তর? আমি কই–কিছু না। টুকু ভাই হাত বাড়ায়া আমার কপালে হাত দিয়া দেখে, জ্বর-টর আইল নাকি? কপাল ঠান্ডা দেইখা নিশ্চিন্ত হইয়া উলটা দিকে ফিরা শোয় কমান্ডারে।

আমার চিন্তা কিন্তু অন্য জায়গায়! একটা ছোটো শব্দ হুনছি একটু আগে।

সিথানের কাছে হাত বাড়ায়া দেখি ইস্টেনটা (স্টেনগান) আছে কি না। গোয়ালের বাইরে লড়াচড়ার আওয়াজ পাইয়া উইঠা যাই। ইস্টেনটা হাতে লইয়া বাইরে যাই, একাই। গিয়া দেখি–নাহ, খালি একটা গোরু। এ বাড়ির মালিক আমাগো লাইগা গোয়াল খালি কইরা যে

গোরুডারে উঠানে বাইন্দা রাখছিল, হেইডা জানি কেমনে ছুইটা আইসা গাদা থেইক্যা খেড় খাইতেছিল। আমি ফিইরা যাই গোয়ালে।

টুকুভাই জিগায়–কই গেছিলি, 'শুয়োর' (রাজাকার) আইছে নাকি? আমি কই–না, একটা গোরু। টুকু ভাই কয়–শুইয়া পর। টুকু ভাই অন্যরকম মানুষ। লিডার না? এমনে কি আর লিডার অওন যায়? কমান্ডার অওন সোজা কথা না। কিছু লাগে নেতা অইতে।"

সাত্তার শিকদার একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেন, 'কত অপারেশন যে করছি তার হিসাব নাই। দাকোপ, বটিয়াঘাটা, কয়রা, গল্লামারী, রামপাল, শিরোমণি–বাকি রাখি নাই কিছু। যেহানে গেছি, আমি গুলি খরচ করতাম কম! কারণ, গুলি তো শর্ট (short) আছিল, খরচ কইরা ফালাইলে আবার পাইতে পাইতে অনেকদিন লাগে। বেশির ভাগ সমে (সময়ে) বেনেট (বেয়নেট) আর গলাচিপা দিয়া কাম সারতাম।' একটু হেসে নিজের হাত দুখানা দেখিয়ে বলেন, 'হাতে তো মেলা শক্তি আছিলো, বুঝেন না?' একটু তৃপ্তির হাসি আসে সাত্তার শিকদারের মুখে।

এরপরের ইতিহাস সবার জানা। এলো ১৬ ডিসেম্বর। বিজয় এলো। মুক্তিযোদ্ধারা শহরে প্রবেশ করে দেখেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে খুলনা শহর। এখানে-ওখানে পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। গল্লামারী খালের স্রোত আটকে আছে লাশের চাপে। কোনোটার হাত-পা আছে, কোনোটির নেই। অধিকাংশ নারীর শরীরের বিভিন্ন অংশ খাবলে নিয়েছে নরপশুরা। ফরেস্ট ঘাট, সার্কিট হাউজ–সব জায়গায়ই একই অবস্থা!

সেই গল্লামারী খালপাড়ের পাশেই ছোট্ট একটি মাঠ। ওই মাঠেই সেদিন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয় স্বাধীনতার পতাকা। পতাকার দড়ি কে প্রথমে টানবে, এ প্রশ্ন আসতেই কামরুজ্জামান টুকু বললেন, 'সাত্তার শিকদারই তুলবে আজ প্রথম পতাকা।' সাত্তার তো কেঁদে-কেটে অস্থির, 'আপনেরা থাকতে আমি কেন?' অবশেষে সম্মিলিতভাবেই তোলা হলো সেদিনের প্রথম পতাকা।

এরপরই সর্বসম্মতভাবে একটি সিদ্ধান্ত হলো–খুলনার সব শহিদের স্মৃতির উদ্দেশে গল্লামারী খালপাড়ে স্থাপিত হবে একটি স্মৃতিসৌধ, সামনে থাকবে একটি পতাকাস্তম্ভ। আর সাত্তার শিকদারই হবেন এই কমপ্লেক্সের তত্ত্বাবধায়ক। প্রতিদিন সকালে সাত্তার শিকদার পতাকা তুলবেন আর সন্ধ্যায় নামাবেন, এখানেই আমার মূল কাহিনির শুরু।

এই সাত্তার শিকদার ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আমার সঙ্গে কথা হওয়ার দিন পর্যন্ত (১৯৯৭) একদিনের জন্যও খুলনা ছেড়ে বাইরে যাননি, শুধু পতাকা তোলা এবং পতাকা নামানো থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায়! যদি অল্পকিছুক্ষণের জন্য গিয়েও থাকেন কাছাকাছি কোথাও, চলে এসেছেন বিকালের আগেই। ঝড়তুফান, বৃষ্টিবাদল কিছুই তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি এই পতাকা উত্তোলন থেকে।

সাত্তার শিকদার বলে চলেন, 'আমি না থাকলে এই পতাকার যত্ন করবে কেডায়? পতাকায় একটু ময়লা লাগলে নিজের হাতে ধুইয়া দেই। অন্যে হাতে দিলে হে যদি পতাকা আছড়ায়! হাবিজাবি কাপড়ের লগে যদি পতাকা রাখে! এই পতাকার মর্ম তো হগলে বুঝবো না ভাই। আমরা যুদ্ধ করছি বনজঙ্গলে, আমরা বুঝি এটার দাম কত!'

সাত্তার শিকদারের গাল বেয়ে জলের স্রোত নেমেছে ততক্ষণে। চোখের জলে ভিজে গেছে তার চিতানো বুক। আমার ক্যামেরা সহকারীদের মাঝে কে যেন একজন ডুকরে কেঁদে উঠল এই সময়। আমার ক্যামেরার 'ভিউ-ফাইন্ডার' ঝাপসা হয়ে গেছে অনেক আগেই। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে থাকি। তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি, হ্যাঁ, আমি শুনছি, আপনি বলুন ভাই। ক্যামেরা চলতে থাকে, পাল্লা দিয়ে চলে সাত্তার শিকদারের কথা।

কেঁদে কেঁদে বলে চলেন সাত্তার শিকদার, "দেখেন, আমার ছেলেরা আমারে কয়–বাবা, তুমি 'পতাকা পতাকা' কইরা কী পাইলা? আমাগো ভবিষ্যৎ কী? আমি কই–একাত্তরে তোদের ফালাইয়া থুইয়া যখন যুদ্ধে চইলা গেছিলাম, সেখান থেইকা আমি না ফিরলে তোরা কী করতিস? আল্লায় তোগোরে দেখবো বাজান, তোরা নিজেরা কিছু কইরা খা। আমারে টানিছ না। আমারে তোরা মাফ কইরা দে বাজান! আমি এই পতাকার লাইগাই জন্মাইছি, এই পতাকা নিয়াই মরুম (মরব)!"

সাত্তার শিকদারের কথা শুনে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার জোগাড়! আমার সহকারীরা কাজ ছেড়ে কেউ কেউ বসে পড়েছে মাটিতে। ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে আমি আধা ভেজা রুমাল দিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করি! অভূতপূর্ব একটি মুহূর্ত তৈরি হয় সাত্তার শিকদারের বয়ানে। বীরের মুখে যুদ্ধের বয়ান।

২০০৪ সালে পেশাগত কাজে আবারও একবার গিয়েছিলাম খুলনায়। ওখানে অবস্থানের দ্বিতীয় দিনেই পুরো ইউনিট নিয়ে গিয়েছিলাম মহান এই মানুষটিকে খুঁজতে। গিয়ে দেখি গল্লামারী শহিদ স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্সের সেই পুরোনো অবয়ব আর নেই। প্রধান সড়কে বেশকিছু দোকানপাট-কমপ্লেক্সটির মূল বিস্তৃতিকে সংকুচিত করে ফেলেছে। কিছুটা ঢেকে গেছে সৌধটি!

সেদিন প্রধান সড়কের ওপরেই একটি মুদি দোকানের সামনে ছোট্ট একটি বেঞ্চিতে বসেছিলেন সাত্তার শিকদার। খালি গা, কাঁধে একটি পুরোনো জলগামছা। মুখের দাড়ি আর বুকের পশমগুলো শতভাগ সাদা হয়ে গেছে! হাতে একটি মাথা বাঁকানো লাঠি। লাঠির বাঁকা অংশে থুতনি রেখে সাত্তার শিকদার তাকিয়েছিলেন দূরে কোথাও, নিষ্পলক। আমি গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি। মৌন ভেঙে আমার দিকে তাকিয়ে আধো আধো শব্দে কী যেন বলতে চাইলেন। কিছুই বোঝা গেল না!

জানা গেল স্ট্রোক করেছিল কিছুদিন আগে। এখন আর স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন না সাত্তার শিকদার। শরীরের একপাশ অবশ। খুঁড়িয়ে চলেন। চিনতে কষ্ট হয় কাছের মানুষদের। বহু চেষ্টা করেও আমার সঙ্গে ওনার স্মৃতির (১৯৯৭ সালের) কিছুই স্মরণ করাতে পারিনি! ওই অবস্থায়ই কয়েকটা শট নিয়ে ফিরে এসেছিলাম ভেজা চোখ নিয়ে।

পরে জেনেছি, মহান এই বীরযোদ্ধা না ফেরার দেশে চলে গেছেন বেশ কবছর আগেই। বুকটা শূন্যতায় ভরে গেল হঠাৎ! ওনার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

আজ আমাদের সন্তানরা যখন লাল-সবুজ পতাকা গায়ে জড়িয়ে কিংবা মাথার ওপরে বাতাসে উড়িয়ে উল্লাস করে, এই পতাকাটাকে যখন আপন করে নেয়, তখন বুকটা ফুলে ওঠে। প্রচণ্ডভাবে মনে পড়ে সাত্তার শিকদার আর কেবলই সাত্তার শিকদারদের কথা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি অঙ্গুলির ইশারায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালি (কিছু স্বাধীনতাবিরোধী বাদে) সেদিন এক হয়ে লড়েছিল একাত্তরে। এনেছিল বিজয়। এনেছিল স্বাধীনতা। স্বাধীন সেই দেশটি আজ ৫৩ বছরের পূর্ণ এক যৌবন নিয়ে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে। বাংলার আকাশে আজ উড্ডীন সাত্তার শিকদারদের সেই রক্তমাখা লাল-সবুজ পতাকা।

সেই পতাকা আজ হস্তান্তরের সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের কাছে। হস্তান্তরের প্রাক্কালে এই দেশ আর মাটির কাছে শুধু ওই প্রার্থনাটাই করি–'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দিও শকতি'! জয় বাংলা।

লেখক: প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও কলাম লেখক

প্রবন্ধ

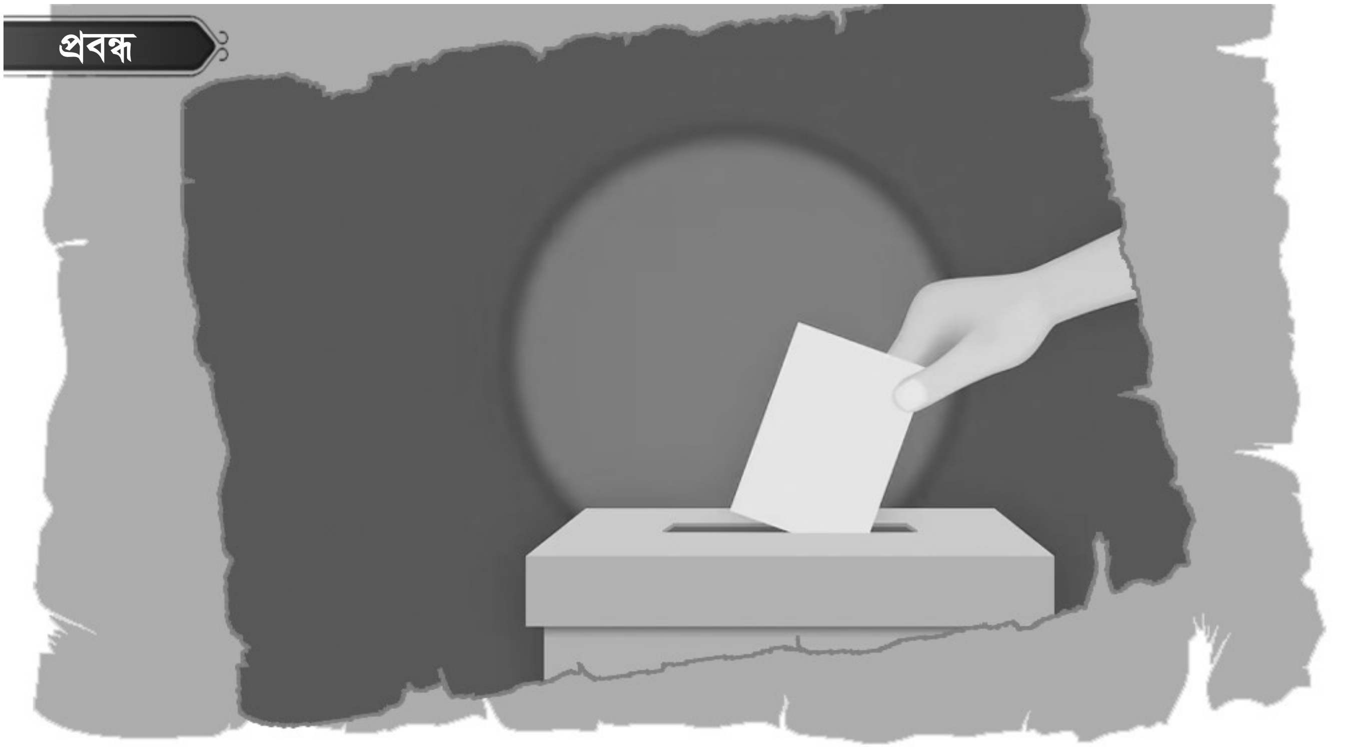

নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিকতা

আকিল জামান ইনু

নির্বাচনি ইতিহাসের পাতায় উঁকি দিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৫০৮ সালে প্রাচীন গ্রিসে এক অদ্ভুত নির্বাচনি ব্যবস্থার খোঁজ পাওয়া যায়। ইতিহাসবেত্তারা আবার একে বলেছেন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের গণতান্ত্রিক চর্চা। আক্ষরিক অর্থে বললে সে নির্বাচনের একটি অংশকে বলতে হয়–নির্বাসনের নির্বাচন। সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে–এমন পুরুষ ভোটাররা ভোটদানের অধিকারী ছিলেন। প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য থেকে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে চান–এমন ব্যক্তি নির্ধারণে তারা প্রতিবছর ভোট দিতেন। সাধারণত ভাঙা মাটির পাত্রে (Ostraka) তারা নাম লিখে ভোট দিতেন। এই Ostraka থেকে বর্তমান Ostracize শব্দটির উদ্ভব। ৬ হাজারের বেশি ভোটপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া ব্যক্তিকে নির্বাসনে যেতে হতো। কেউ যদি ৬ হাজারের বেশি ভোট না পেত তবে সবাই থেকে যেত। সৌভাগ্য যে কেবল সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে–এমন পুরুষ ভোটাররা ভোটদানের অধিকারী হওয়ায় এবং ভোটার সংখ্যা কম হওয়ায় চরম অজনপ্রিয় ব্যক্তি ছাড়া এমন দুর্গতি খুব কমসংখ্যক প্রার্থীর ভাগ্যেই জুটেছে। আজকের বাস্তবতায় বিষয়টি কেমন দাঁড়াত, সে কল্পনা ছেড়ে দিয়ে আমরা বরং স্বস্তি প্রকাশ করতে পারি–ভাগ্যিস সেদিন আর নেই!

আজকের দিনে যে নির্বাচনি ব্যবস্থা আমরা দেখি, তাও গড়ে উঠেছে ইতিহাসের অনেক বাঁক পেরিয়ে। প্রাচীন এথেন্স কিংবা রোমের নির্বাচনব্যবস্থা ছাড়িয়ে পোপ বা রোমান সম্রাট নির্বাচনের পাশাপাশি 'অভিজাতদের জন্য অভিজাতকেন্দ্রিক' মধ্যযুগীয় নির্বাচনব্যবস্থা আজ ইতিহাসের

অধ্যায়। সেখান থেকে কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচনব্যবস্থার দিকে পরিবর্তনের শুরু সপ্তদশ শতাব্দীতে। ফরাসি বিপ্লব বা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত 'All men are created equal' চিন্তার জগতে এবং রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তারপরও শাসনব্যবস্থায় আইনগতভাবে সক্ষমদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। এ পথে ব্রিটেনে Reform act of 1832 আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ ধারাবাহিকতায় উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয় ১৯২০ সালের মধ্যে। যদিও নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হতে আরও সময় লেগেছে (ব্রিটেনে ১৯২৮, ফ্রান্সে ১৯৪৪, বেলজিয়ামে ১৯৪৯, সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১)। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও 'One person, one Vote' বিষয়টি বাস্তবায়নেও যথেষ্ট সময় লেগেছে। ১৯৪৮ পূর্ব যুক্তরাজ্যে বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়াতেও ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। কারণটি সেই একই–অভিজাতদের, সুবিধাভোগীদের ক্ষমতা ধরে রাখা। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে Voting Rights Act in 1965 গৃহীত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত বিশেষত দক্ষিণের অধিবাসী আফ্রিকান- আমেরিকানদের জন্য ভোট প্রদানে আইনগত প্রতিবন্ধকতা ছিল।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা কিংবা All men are equal শুনতে যতই ভালো শোনাক, রাষ্ট্র শাসনে প্রতিটি উপযুক্ত নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সময় লেগেছে। বিগত শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধকালে সোভিয়েত ব্লকে 'সোভিয়েত মডেল'-এর নির্বাচন দেখেছে, এখনকার উত্তর কোরিয়ার 'এক প্রার্থী, এক ব্যালট'-এর নির্বাচন তো বহুল আলোচিত। আবার সর্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো সময় নিয়েছে অনেক। এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলোয় উপনিবেশবাদ ছিল বড়ো সমস্যা। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে অবশ্য আর্জেন্টিনার নির্বাচনি ইতিহাস বেশ পুরোনো। তারপরও এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই–গত শতাব্দীর সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের ধারণাটি বিস্তৃত হয়েছে। যেভাবেই দেখি না কেন বিশ্বব্যাপী আইনগতভাবে উপযুক্ত সক্ষম নারী-পুরুষ, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে নির্বাচনের ইতিহাসকে খুব পুরোনো বলা যাচ্ছে না। আর নির্বাচনি ইতিহাস এবং এর বাঁকগুলো একজন ভালো নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদককে সমৃদ্ধ করবে তার নিজ ক্ষেত্রে, এ কথা তো বলাই যায়। পাশাপাশি এখানে তিনি পাবেন লেখার চমৎকার সব উপাদান।

অতীতের পাতা থেকে বর্তমানে উঠে আসি। সহজ করে বললে, আজকের দিনে নির্বাচনের যে ধারণা, এর মূলে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিটি ভোটারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, তার অধিকারচর্চা নিশ্চিত করা। এই যে রাষ্ট্র পরিচালনায় সবার অংশগ্রহণ কথাটি আমার বলি, সেটিকে একটি পদ্ধতিগত রূপ দেওয়াও কিন্তু একসময় একটি বড়ো সমস্যা ছিল। বিষয়টি তো এমন নয় যে প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি বিষয়ে আলাদা-আলাদা করে মতামত দেবে, সেটি সম্ভবও নয়। আবার তার অংশগ্রহণ ছাড়া তার অধিকার সুরক্ষার কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও তো সম্ভব নয়। সেখান থেকেই আজকের নির্বাচনি ধারণার উদ্ভব। মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার্থে তার পছন্দের প্রার্থী বেছে নেবে, যারা তাদের হয়ে একটি নির্ধারিত সময় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। এই ধারণাটি কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা নয়, স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এতে যেমন জবাবদিহি নিশ্চিত হয়, তেমনই গণমানুষও নিজেকে শাসনব্যবস্থায় সম্পৃক্ত ভাবেন।

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এখানেই নির্বাচন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। যদিও বলা হয়– 'Democracy is not Just an Election, it is our daily life'। শুধু নির্বাচন কখনোই গণতন্ত্রের একমাত্র মানদণ্ড নয়; কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এটিকে প্রধান মানদণ্ড বলা যায়। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বহুমত ধারণে, সহনশীলতায়। এই মত প্রতিফলনের বৈধ মাধ্যমও নির্বাচন। অন্য অনেক বহুমতের মতো গণতন্ত্রে নির্বাচনি পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ থাকতে স্থান-কালভেদে পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু বিকল্পকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রের পথচলায় শেষ পর্যন্ত নির্বাচনই এখন গণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় সর্বজনীন অংশগ্রহণের একমাত্র বিকল্প। গণতন্ত্র নির্ভর করে অবাধ মতপ্রকাশের অধিকার এবং যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিকদের ভোটের ওপর। অর্থাৎ নাগরিকের যথাযথ তথ্যপ্রাপ্তি এবং তার ওপর নির্ভর করে ভোটে সিদ্ধান্ত প্রদান গণতান্ত্রিক চর্চায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। John F. Kennedy-এর বিখ্যাত উক্তি 'The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all' বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, একজন ভোটারের অজ্ঞতা যখন সবার ক্ষতির কারণ, তখন সেই অজ্ঞতা দূর করার মূল দায়িত্ব কিন্তু গণমাধ্যমের। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে অনেকে এমনও বলে থাকেন, নির্বাচন এখন যতটা মাঠের, ততটাই গণমাধ্যমের। গণমাধ্যম ও সাংবাদিক নির্বাচনকালে এ সংক্রান্ত সংবাদ ও বহুমত প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য, তাদের অবস্থান, রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মসূচি পৌঁছে দেন জনগণের দোরগোড়ায়। জনগণকে মতপ্রকাশের সুযোগ তৈরি, গণতান্ত্রিক বিতর্ক এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যেন নির্বাচনি প্রচারের কেন্দ্রে থাকে, সে লক্ষ্যেও কাজ করে গণমাধ্যম। গণতন্ত্রের অন্যতম অভিভাবক হিসাবে নির্বাচনি ফলাফলের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাও অনেকাংশে নির্ভর করে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ভূমিকার ওপর। পেশাগত এ দায়িত্ব পালনের পথে একজন সাংবাদিককে অনেক চাপ মোকাবিলা করেই পথ চলতে হয়। নির্বাচনে অনেক পক্ষ থাকে, সবাই ফলাফল নিজের পক্ষে আনতে গণমাধ্যমকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে চান। ক্ষমতাবান মহল, রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী প্রার্থী থেকে গণমাধ্যমের মালিক পক্ষও নিজের মতো করে প্রভাব বিস্তার করে বা করতে সচেষ্ট হয়। আবার নির্বাচনি সাংবাদিকতায় একজন নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদককে নিজের মতামতের ঊর্ধ্বে থাকাটাও বড়ো চ্যালেঞ্জ। ভোটদানের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই মত যদি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রভাব ফেলে তবে বিপত্তি নিশ্চিত। এক্ষেত্রে তিনি সাংবাদিকতার মৌলিক ও নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করবেন, সেটাই কাম্য। সহজ কথায় সাংবাদিকতা হতে হবে সত্যের অনুসন্ধান, বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশন, ভারসাম্যপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও মানবিক মর্যাদা বজায় রেখে। সেটি অন্যসব ক্ষেত্রের মতো নির্বাচনি সাংবাদিকতায়ও প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' বলে পরিচিত গণমাধ্যম–সরকার, কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিস্বার্থে কাজ করে না। একজন সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা নাগরিকের প্রতি। যাদের তিনি সত্য তথ্য জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নির্বাচনবিষয়ক সাংবাদিকতাকে মোটা দাগে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. প্রাক-নির্বাচনি সাংবাদিকতা
২. নির্বাচন চলাকালীন সাংবাদিকতা
৩. নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিকতা

তিনটি ক্ষেত্রেই উপস্থাপন বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি আকর্ষণীয় প্রতিবেদনের মূল বিষয় হচ্ছে পাঠক-দর্শকের কাছে সহজ উপস্থাপন। নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অনেক জটিল দিক থাকে, আপনার প্রতিবেদনে সেটি যথাসম্ভব সহজ করে উপস্থাপন করুন যাতে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তাটি সহজে পৌঁছায়। একটি জটিল বিষয়কে সাধারণের বোধগম্য করে উপস্থাপন একজন সাংবাদিকের বড়ো গুণ। একজন ভালো

সাংবাদিক অল্প শব্দে অনেক কথা বলবেন। ছোটো ছোটো তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করুন। ইন-ডেপথ স্টোরির ক্ষেত্রে আগে থেকেই একটি রূপরেখা তৈরি করুন, যেটি আপনাকে পরবর্তীতে একটি ভালো প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্য করবে। নির্বাচন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং পুরো বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ফলাফলকেন্দ্রিক। ভোটগ্রহণ শেষে মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে ফলাফল জানার। প্রতিটি গণমাধ্যম দর্শক আগ্রহের বিবেচনায় সবার আগে তার পাঠক-শ্রোতাদের ফলাফল জানাতে চায়। কিন্তু এই সবার আগে হলো প্রতিযোগিতা–সাংবাদিকতা হলো 'সবার আগে–সবচেয়ে নিখুঁত'। বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন। একজন ভালো সাংবাদিক এই ক্লিক-বেইট যুগেও সবার আগের স্রোতে গা ভাসাবেন না। বরং নির্ভুল তথ্য পরিবেশনে মনোযোগী হবেন। মনে রাখবেন, এ পর্যায়ে সামান্য ভুলও যেমন পুরো বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, তেমনই অপশক্তিগুলো সুযোগ নেবে। তাই সতর্ক থাকুন, প্রয়োজনে সময় নিন, নির্ভুল যাচাইকৃত তথ্য পরিবেশন করুন।

মনে রাখতে হবে, কেবল ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমেই নির্বাচনি কভারেজ শেষ হয় না। বরং ফলাফল, ঘোষণার পর থেকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নতুন নির্বাচনি সাংবাদিকতার শুরু। নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিকতায় কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আলোয় আনতে হয়।

প্রভাবিত করতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ তো জোরেশোরেই উচ্চারিত হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ আছে উত্তর কোরিয়া, চীন বা ইরানের বিরুদ্ধেও। আমাদের দেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও আমরা বাইরের অনেক দেশ থেকেও মিথ্যা তথ্য, গুজব ছড়ানোর চেষ্টা দেখেছি।

আবার নির্বাচনে প্রার্থীরাও অনেক সময় ভুল তথ্যের উৎস হয়ে ওঠেন। একটি গবেষণায় দেখা যায়, নির্বাচনসংক্রান্ত প্রার্থীদের ফেসবুকে দেওয়া ২০১টি পোস্টের মধ্যে ৬৩টি ছিল বিভ্রান্তিকর তথ্যসংবলিত। অর্থাৎ, ৩১ শতাংশ পোস্ট ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচনে ভোটগ্রহণের পর দুটি বিষয় ঝুঁকিপূর্ণ। প্রথমত, ফলাফল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের ভুল বার্তা ছড়ানো। দ্বিতীয়ত, ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা মানুষের মধ্যে গুজব ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়া আর সেটি যদি কোনো কারণে ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হয় তবে তো কথাই নেই। কারণ, যথাযথ তথ্যের অভাবে শূন্যস্থান দখল করে ভুল তথ্য-অপতথ্য।

একজন নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদক যথাযথ যাচাইকৃত তথ্য পরিবেশন করবেন, সেটিই কাম্য। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সেটি যথেষ্ট কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। একজন সাংবাদিকের কাজ সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। তোয়াব খানের ভাষায় সেটি করতে হলে আপনাকে আগে মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে হবে। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক এন্ড্রু রেভকিনের মতে, আজকের দিনে সাংবাদিকতায় কেবল তথ্য পরিবেশনই যথেষ্ট নয়। তিনি মিথ্যা-ভুল তথ্য মোকাবিলায় কাজ করবেন, গুজবের উৎস চিহ্নিত করবেন এবং তা নির্মূলে ভূমিকা রাখবেন। মনে রাখবেন, গুজব রটনাকারীদের জন্য নির্বাচন হচ্ছে রীতিমতো উৎসব। নির্বাচনপূর্ব থেকেই এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুরো সময় একজন ভালো প্রতিবেদক বিষয়টি তীক্ষ্ণ নজরে রাখবেন। প্রতিরোধে কাজ করবেন। সাংবাদিকতা অনেকেই করছেন; কিন্তু জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেন খুব কম মানুষ। এই প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার পেছনে মূল কারণ বিশ্বাসযোগ্যতা। আপনি যদি নিজেকে সেই উচ্চতায় দেখতে চান তবে কখনোই গুজবের উৎস হবেন না বরং অপতথ্য, ভুল তথ্য ও গুজব মোকাবিলায় ভূমিকা রাখুন। দিনশেষে একজন সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়–বিশ্বাসযোগ্যতা।

> পেশাগত এ দায়িত্ব পালনের পথে একজন সাংবাদিককে অনেক চাপ মোকাবিলা করেই পথ চলতে হয়। নির্বাচনে অনেক পক্ষ থাকে, সবাই ফলাফল নিজের পক্ষে আনতে গণমাধ্যমকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে চান

১. নির্বাচন-পরবর্তী সরকার গঠন, সংরক্ষিত নারী আসন বণ্টনসহ অন্যান্য তথ্য

নির্বাচন যেহেতু ফলাফলকেন্দ্রিক, তাই নির্বাচন শেষে আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে কারা সরকার গঠন করছেন, কারা যাচ্ছেন বিরোধী দলে। এই প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে আইনের সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান। যদিও এই বিধিবিধানগুলো আমাদের গণমাধ্যম দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময় থেকেই প্রচার করে থাকে, তবু নির্বাচন শেষে ফলাফল সামনে রেখে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা জনগণের সামনে বিষয়টি পরিষ্কার করবে। কারা সরকার গঠন করছে, কী ধরনের সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, বিরোধী দল হতে যাচ্ছেন কারা–বিষয়গুলো সংবিধান ও আইনের আলোকে স্পষ্ট করুন। বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরনের তথ্যগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যথাযথ তথ্যের অভাব সংশয়ের সৃষ্টি করে। সংরক্ষিত আসন বণ্টন, প্রথম অধিবেশন আহ্বানসহ যাবতীয় আইনগত দিকগুলো স্পষ্ট করুন।

২. গুজবের উৎস হবেন না, প্রতিরোধে সক্রিয় হন

তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের এই যুগে গুজবের ভয়াবহতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। অপতথ্য, ভুল তথ্য কিংবা গুজবের উৎস কেবল এখন কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বা দেশের ভেতরে সীমাবদ্ধ নেই–রীতিমতো আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন নির্বাচনে বাইরের হস্তক্ষেপ নিয়ে তুমুল আলোচনা হচ্ছে। মার্কিন নির্বাচনকে

৩. নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা

নির্বাচনে যেহেতু অনেক পক্ষ জড়িত থাকে, তাই সহিংসতার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আমাদের এখানে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১) নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার দগদগে ক্ষত এখনো রয়ে গেছে। আবার নির্বাচনের ফলাফলের পর অনেক ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে সহিংসতায় মেতে উঠে কিছু মহল। স্বার্থান্বেষী মহল আবার এ ধরনের সহিংসতাকে হরেদরে এক করে নির্বাচনকেই বিতর্কিত করতে চায়। কাজেই সহিংসতার ঘটনাগুলো যাচাই করুন। নির্বাচনকেন্দ্রিক

সহিংসতার প্রকৃত চিত্র এবং কারণ সামনে আনুন। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে জবাবদিহির মুখে দাঁড় করান। নির্যাতিতদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

৪. নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তি

যে কোনো নির্বাচনে প্রার্থীরা ভোটারদের সামনে প্রতিশ্রুতির পসরা সাজিয়ে হাজির হন। এখানে নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিকতার একটি বড়ো সুযোগ রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আমরা দেখেছি দু-একজন প্রার্থী কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় এসেছেন। অন্যদের উৎসাহিত করতে এ ধরনের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনাই যায়। আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্যও এখানে বড়ো সুযোগ রয়েছে। আপনার এলাকার বিজয়ী প্রার্থী তার প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করছেন, সময় ধরে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রচার করুন। এক্ষেত্রে নির্বাচন শেষ থেকে শুরু করে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের জবাবদিহির আওতায় আনার সুযোগ রয়েছে। আবার কেবল স্থানীয় প্রার্থী নন, প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের পূর্বে তাদের ইশতাহার প্রকাশ করে থাকে। কেন্দ্রে কাজ করা সাংবাদিকরা পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ইশতাহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং ঘাটতি নিয়ে কাজ করতে পারেন—এতে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। এই প্রতিবেদনগুলোয় সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কথাও বলুন।

৫. নির্বাচন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন, সাক্ষাৎকার

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে তাদের বক্তব্য জানাতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। সেটি হতে পারে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন পক্ষ, রাজনৈতিক দল, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক দল, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা প্রভৃতি। এ সম্মেলনগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিন, যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণ করুন, প্রতিটি পক্ষের ভূমিকা বিবেচনায় যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে প্রশ্ন তৈরি করুন। এখনকার বৈশ্বিক জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেকেই নিজের মতো করে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সত্য তুলে আনুন—সেজন্য যথাযথ প্রস্তুতির বিকল্প নেই। আরেকটি বিষয় লক্ষ রাখবেন সংবাদ সম্মেলনে, যা সরাসরি বলা হলো সেটাই সব নয়। হয়তো ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো বক্তব্য থেকে আপনি একটি ভালো প্রতিবেদনের উপাদান পেয়ে যাবেন। নির্বাচন শেষে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের নির্বাচন সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মতামত জানতে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির সাক্ষাৎকারও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রেও যথাযথ প্রস্তুতির বিকল্প নেই।

৬. নির্বাচনি ব্যয়

কালোটাকা ব্যবহারে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার ঘটনা নতুন নয়। এতে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতন্ত্র। সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বাক্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, 'Follow the money.' প্রার্থীদের হলফনামায় নির্বাচনের ব্যয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় কত, অর্থের উৎস, কোনো অসংগতি পেলে তা নিয়ে প্রতিবেদন করুন।

৭. অনিয়মের অভিযোগ ও প্রতিকারব্যবস্থা

বিভিন্ন মহল থেকে নির্বাচন ঘিরে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে নানান অভিযোগ আসে। এ ধরনের অনেক অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ রয়েছে। প্রার্থীরাও নির্বাচন কমিশনে ক্ষেত্রভেদে অসন্তুষ্ট হলে উচ্চ আদালতে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন। এই অভিযোগ এবং প্রতিকারে কী ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে, তা অনুসরণ করুন—মানুষকে জানান।

৮. তথ্য সংরক্ষণ করুন

একজন ভালো সাংবাদিকের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক, সাংবাদিকতায় একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি জাফর ওয়াজেদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সদ্যসমাপ্ত একটি নির্বাচনের অনেক তথ্যই পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের অনেকের কাছে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতাহার সংরক্ষণে নেই। বিষয়টি কিন্তু আগামীর গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ।' প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে জবাবদিহির আওতায় আনতে নির্বাচনপূর্ব তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো সংরক্ষণ জরুরি। প্রার্থীদের সম্পদবিবরণী, ব্যয়, মামলার তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলাফল অর্থাৎ বিভিন্ন আসনে বিভিন্ন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের হিসাবও ভবিষ্যৎ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও আগামী দিনে হয়ে উঠতে পারে আপনার প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই যথাসম্ভব তথ্য সংরক্ষণ করুন।

৯. নির্বাচনি আইনের সংস্কার, ভোটার তালিকা হালনাগাদসহ অন্যান্য তথ্য

সময়ের সঙ্গে বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন, সংস্কার হয়। বিষয়টি যেহেতু জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ সংক্রান্ত তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করুন। এছাড়া একটি নির্বাচন শেষে পরবর্তী ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সীমানা পুনর্বিন্যাস—এসংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবেদন তৈরি করুন। নতুন আইনের সুবিধা-অসুবিধার দুটো চিত্রই তুলে ধরুন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত নিন। হালনাগাদ প্রক্রিয়া জনগণের জন্য কতটা সুবিধাজনক, সেখানে কোনো সমস্যার দিক থাকলে তাও তুলে ধরুন। বিষয়টিকে অনেকেই প্রাক-নির্বাচনি সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

১০. ভোট না দেওয়া মানুষের কথাও বলুন

ভোট না দেওয়া প্রসঙ্গে George Jean Nathan-এর বিখ্যাত উক্তি হলো, 'Bad officials are elected by good citizens who don't vote'। এ পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবেই কাম্য নয়। তারপরও বিশ্বজুড়ে ভোট না দেওয়ার অংশটি উদ্‌বেগজনক। গণতন্ত্র যেহেতু বহু মতকে ধারণ করে পথ চলে, তাই যারা ভোট দিয়েছেন তাদের মতোই যারা দেননি, তাদের মতামতও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতামতও চমৎকার প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে, যা আখেরে গণতন্ত্রকেই শক্তিশালী করবে।

গণমাধ্যমের বৃত্ত, জনগণের আগ্রহকেন্দ্রিক আর সেক্ষেত্রে নির্বাচনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যকিছু হতে পারে না। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি জনসম্পৃক্ত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিকল্প নেই। এখানেই নির্বাচনকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার গুরুত্ব। যথাযথ তথ্য পরিবেশন করে একটি জনসম্পৃক্ত নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে গণমাধ্যম তার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে, সেটাই কাম্য। নয়তো Abraham Lincon-এর ভাষায়—Elections belong to the people. It's their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn behinds, then they will just have to sit on their blisters.

সেই পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়। একটি নির্বাচনকে জনসম্পৃক্ত, যথাসম্ভব অংশগ্রহণমূলক করতে গণমাধ্যম তার যথাযথ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে—সেটাই প্রত্যাশা।

লেখক: সহ-সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রবন্ধ

একাত্তরে চুয়াডাঙ্গা: প্রতিটি মানুষ হয়ে যায় একেকটি যোদ্ধা

মোস্তফা হোসেইন

চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম। নাম ছয়ঘরিয়া। ওই গ্রামের মিনহাজউদ্দীন মালিকের ছেলে মো. নুরুল ইসলাম মালিক। পড়তেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে। কলেজজীবনে এসে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি হলেন সেই সুবাদে। উনসত্তরে যখন গোটা দেশ উত্তাল হয়ে পড়ে, নুরুল ইসলাম মালিক সেই আন্দোলনে অংশ নেন ছাত্রলীগের নেতা হিসাবে। গ্রেফতারবরণ করেন আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনীর হাতে। কারাগারে থাকতেই সারা দেশে নির্বাচন হলো। পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে নুরুল ইসলাম বলেন, 'সত্তরের নির্বাচনের বেশ আগে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই ঝিনাইদহ কলেজে। সায়েন্স বিভাগে। তখন কলেজের নিজস্ব হোস্টেল ছিল না। দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে থাকতাম। শহরতলিতেই ছিল সেই বাড়ি। সেখান থেকে চলে এলাম চুয়াডাঙ্গা কলেজে। তখন সেলুন ভাই চুয়াডাঙ্গার সব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই আমার পরিচয় ছিল। উল্লেখ্য, আমি যখন সরোজগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ি, তখন তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। তিনি সেসময় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন।

আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। কিন্তু সেলুন ভাই আমার মোড় ঘুরিয়ে দেন। আমি স্কুলে পড়াকালেই আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। সেই হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে আমার একটু সুনাম ছিল। তবে এই শখের কাজেও দেশাত্মবোধ জাগতে পারে, সেরকম কিছু ভাবনায়

ছিল না। একটা স্মৃতির কথা বলি। এটা পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময়। খুলনা বিএল কলেজে ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এমন সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে। আর তো আবৃত্তি অনুষ্ঠান হলো না। চলে এলাম বাড়িতে। ঠিক তখনই আওয়ামী লীগ প্রচার শুরু করল, এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল।

ফলে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বাংলাকে আলাদা করা। নেতারা সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য ওঠেপড়ে লাগেন। পূর্ববাংলার মানুষও সমর্থন দিতে থাকে। এই সমর্থনের সূত্র ধরে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার প্রক্রিয়াটা জোরালো হতে থাকে। যার চূড়ান্ত পরিণতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেখানে তো নিজেকে জড়িয়ে নিলাম ধীরে ধীরে। তখন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাজে স্কুলে স্কুলে ঘুরতে শুরু করি। কলেজে আসার পর দেখি সেখানে নেতৃত্ব করছেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা। ছাত্র সংসদের নির্বাচন এলে বন্ধুরা বলল নির্বাচন করতে হবে। আলিমুজ্জামান সহসভাপতি আর আমি সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলাম। নির্বাচনে সহসভাপতি নির্বাচিত হয় ছাত্র ইউনিয়ন থেকে। আর আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলাম।

মাথায় রাজনীতির পোকা ঢুকে গেছে পুরোপুরি। বঙ্গবন্ধু তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করছেন। ভাবতাম বঙ্গবন্ধু যদি আমাদের এখানে আসতেন। একসময় সেই সুযোগও হয়ে গেল। চুয়াডাঙ্গায় আসবেন বঙ্গবন্ধু। ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতা হওয়ায় আমার ওপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। আশপাশের স্কুলগুলোয় যোগাযোগ করলাম। ওসব স্থান থেকে যাতে সাধারণ মানুষও সভায় যোগ দেয়, সেই চেষ্টাও করলাম। তখন রেলই ছিল একমাত্র যোগাযোগব্যবস্থা। সরকারি আমলাদের মাথায় ঢুকল যদি রেলে হাত দেওয়া যায়, তাহলে সমাবেশে লোকজন কম হবে। তাই সফরের কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে মোবাইল কোর্ট দেওয়া হলো। কলেজের ছাত্ররা তো টিকিট কাটত না। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্ররা যাতে না আসতে পারে। আর ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সেই সুযোগে জেলে ঢোকানো সহজ হবে। তখন তো ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা এক কাতারে চলে এসেছে। এ ঘটনার পর ঐক্য আরও দৃঢ় হলো। সিদ্ধান্ত হলো প্রতিবাদ সমাবেশ হবে। সমাবেশের আগেই আন্দোলন, হলো মিছিল। মিছিল থানার সামনে এলো। কেউ একজন হয়তো ঢিল ছুড়েছে থানার দিকে। পুলিশ ফায়ার ওপেন করে। ওই ফায়ারে ছাত্রদের কেউ কেউ আহত হয়। তবে কয়েকজন সাধারণ মানুষ মারা যায়। আমার সামনে একজন পুলিশ। দেখি রাইফেল তাক করেছে মিছিলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের ব্যারেল উঁচিয়ে ধরি যাতে গুলিটা পাবলিকের গায়ে না লাগে। এরপর রাইফেল কেড়ে নিই। আহতদের মধ্যে গণেশ নামের একটা ছেলে এখনো জীবিত আছে। আর নিহতরা ছিল সবাই গ্রাম থেকে আসা সাধারণ মানুষ। আমরা গেলাম স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতাদের কাছে। তারা আমাদের কথা দিল, গ্রেফতার ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে কাউকেই ছাড়া হলো না। এমন পরিস্থিতিতে আমি গ্রামে চলে যাই। কিন্তু রাতে সেখান থেকেও আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। ঢুকিয়ে দেওয়া হলো চুয়াডাঙ্গা কারাগারে। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় কুষ্টিয়া কারাগারে। একবারে নির্বাচন পর্যন্ত রয়ে গেলাম বন্দি অবস্থায়। কুষ্টিয়ায় বন্দি থাকাকালে আমাদের খাওয়াদাওয়ার খুব সমস্যা হতো না। আমিনুল হক বাদশাহ ও ছাত্রলীগের নেতারা আমাদের জন্য প্রতিদিন খাবার দিতেন কারাগারে। চুয়াডাঙ্গা থেকেও কেউ কেউ খাবার নিয়ে আসত। কারাগারে সবাই মিলে সেই খাবার খেতাম। জেলখানায় একটা ভিআইপি রুম দখল করে নিয়েছিলাম। সত্তরের নির্বাচনের পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

নির্বাচনের পর যখন বেরিয়ে এলাম, ততদিনে দেশের পরিস্থিতি আরও পালটে গেছে। ছাত্রসমাজের ১১ দফা আওয়ামী লীগের ৬ দফায় একত্রিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার কাজ করতে থাকি।

বঙ্গবন্ধু চুয়াডাঙ্গায় আসার আগের একটি কথা বলি। যশোরে এসেছিলেন তিনি। ছাত্রলীগের আশেপাশের জেলা ও মহকুমার নেতাদের ডেকেছেন। তিনি বললেন, কীরে তোরা নাকি সুন্দর একটা অফিস করেছিস। তোদের অফিস আমি দেখব। তিনি যখন চুয়াডাঙ্গা এলেন, তখন ছাত্রলীগের অফিসে এলেন। অফিস তো একটা রুম মাত্র। বসারও জায়গা নেই। সেখানে বসে আসলে আমরা পোস্টার লিখতাম। আর চাটাই। কেউ কেউ বাড়ি যেতে না পারলে সেখানে রাত কাটাত। যাই হোক, তিনি আসবেন বলে আমরা একটা চেয়ার আনলাম। তিনি সেই চেয়ারে না বসে দাঁড়ালেন, ওখানে অনেক মানুষ। তিনি চেয়ারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন। যাওয়ার সময় বললেন, তোফায়েল তোমাদের এখানে থাকবে। কাল তোমরা যশোরে আসো। ছাত্রলীগের নেতারা ছিলেন, নূরে আলম সিদ্দিকী, কাজী আরেফ এমন আরও কিছু নেতার নাম মনে আছে। যাই হোক, তোফায়েল আহমেদসহ আমরা পরদিন যশোর গেলাম। রেস্টহাউজে তিনি নাশতার টেবিলে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। যে নাশতা তৈরি ছিল, সেটাই সবাইকে নিয়ে খেলেন।

ওখানে সবাইকে বললেন, দেশের মানুষ আমাদের সমর্থন করছে। সুতরাং নির্বাচন হলে আমরা জিতব। কিন্তু জেনে রেখ, আমাদের কিন্তু ক্ষমতা দেবে না ওরা। সুতরাং আমাদের চূড়ান্ত ব্যবস্থাও নিতে হবে। দরকার হলে লড়াইও করতে হতে পারে। সুতরাং ছাত্রলীগের ছেলেরা তোমরা প্রস্তুত হও। আরিফ ভাইও সেভাবে বললেন। আমাদের বলা হলো মোটিভেট করতে হবে ছাত্রদের। আমরা এলাকায় এসে সেই কাজই করতে থাকি। একটা পর্যায়ে আমাদের মোটিভেশন আর ছাত্রলীগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। একসময় ছাত্র ইউনিয়ন ও এনএসএফ-এর একটি অংশকে নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। একটা বিষয় বলে নেওয়া দরকার। আমি কিন্তু প্রথম থেকে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম না। আলিমুজ্জামান ছিলেন প্রথম অবস্থায়। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলে আমি সভাপতি হই। সঙ্গে যুক্ত হলেন ছাত্র ইউনিয়নের দুজন সদস্যও। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিল ১১ জন।

এর আগে ৪ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয় রমনা রেস্টুরেন্টে। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রলীগ অফিসে ছাত্রলীগের নেতারা আমাদের স্পষ্ট বলে দিলেন, তোমরা সতর্ক হও। আমাদের যুদ্ধও করতে হতে পারে। সব মিলে যায়। ৫ মার্চ ঢাকায় ছিল ছাত্রলীগের জরুরি সভা। সেখানেও গেলাম। দুদিন পর বঙ্গবন্ধুর জনসভা হবে রেসকোর্স ময়দানে। রয়ে গেলাম তাই। ৭ মার্চ তো বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে দিলেন সব। স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। চলে এলাম চুয়াডাঙ্গা। ছাত্রলীগের কর্মীদের আহ্বান করলাম। সভা চলতে থাকল একের পর এক। কলেজ মাঠে, পাশের আমবাগানে আমাদের বৈঠক হতো।

এরপর শুরু হলো প্রশিক্ষণ-পর্ব। কিন্তু আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কাছ থেকে সহযোগিতা সেভাবে পাওয়া যায়নি। আন্দোলন ও প্রশিক্ষণ চলতে থাকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্রলীগের মাধ্যমে। আনসার বাহিনীর নওয়াব ভাই ছিলেন। তিনি দায়িত্ব নিলেন প্রশিক্ষণের। কলেজ মাঠে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। এটা বিস্তৃত হতে শুরু করে। ছাত্রলীগের নেতারা তখন চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে থাকেন। রাতে নওয়াব ভাইয়ের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে মফস্‌সলে গিয়ে আবার তাদের শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। ছাত্রলীগের চুয়াডাঙ্গার

নেতাদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হলো। তারা যেতে থাকেন বিভিন্ন এলাকায়, প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন কিশোর ও তরুণদের। সাধারণ প্রশিক্ষণ। ২৫-৩০জন এই কাজে যুক্ত হলেন। আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দর্শনা–এমন করে সব জায়গায় প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। আসলে এসব যে সুসংগঠিতভাবে হচ্ছিল, তা বলা যাবে না। স্থানীয় কর্মীদের উৎসাহ দেখে জায়গা নির্ধারণ করা হতো। জীবননগর, আন্দোলবাড়িয়া, সরোজগঞ্জ, রামদিয়া বাজার ইত্যাদি জায়গায় এমন কিছু প্রশিক্ষণ চলে। এর মধ্যে ডাক্তার আসহাবুল হকসহ এমএনএ ও এমপিএরাও যুক্ত হতে থাকলেন।

একটা বিষয় বলতে হবে–নিরাপত্তার বিষয়ে খুব একটা উদ্‌বিগ্ন ছিলাম না। কারণ, সব মানুষই আমাদের পক্ষে ছিল। মুসলিম লীগের কিছু দালাল ছিল; কিন্তু তারা পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। আনুমানিক ৩০ জায়গায় আমরা প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করি। কেন্দ্র থেকে ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রশিক্ষণের কথা বলা হলেও প্রশিক্ষণ শুরু হলে সেখানে ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের একটি অংশ, এনএসএফ-এর একটি অংশও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। তাদের সংখ্যা ছিল কম।

২৩ মার্চ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করি। কুষ্টিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক লাঠিয়াল এলো। তারা আসলে লাঠি খেলত; কিন্তু তাদের সঙ্গে যারা এলো, সবাই লাঠি নিয়ে এসেছে। কয়েক হাজার মানুষ সবার হাতে লাঠি। এটা হয়েছিল ছাত্রলীগের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হলো আগে। তাদের বলা হয়েছিল গার্ড অব অনার হবে। সেখানে নেতাদের সালাম গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আসহাবুল হক এমএনএ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমপিএ, বাদল রশিদ ব্যারিস্টার এমপিএ বললেন, আওয়ামী লীগের নেতাদের সেখানে না থাকাই ঠিক হবে। অতঃপর ছাত্রলীগের নেতারাই পুরো কাজ করলেন।

পতাকা উত্তোলন হলো টাউন মাঠে। তখন কিন্তু সেই সমাবেশ আর ছাত্রলীগের একক ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ, আওয়ামী লীগের সমর্থক–সব একাকার হয়ে যায়। তাদের প্রথম লাইন করে দাঁড় করানো হয়। গার্ড অব অনার গ্রহণ করি আমি। পতাকা উত্তোলন করলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিক জামান নান্টু। সময় ছিল সকাল ১০টার পর। মানুষ আসছে আর স্লোগান দিচ্ছে। অস্বাভাবিক অবস্থা। স্লোগান থামানো যায় না। গ্রাম থেকে মানুষ আসছে। তারা বলছে, যুদ্ধ করবে তারা। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। তারা লাঠি দিয়েই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন কিন্তু আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোকজনও আসত। কিন্তু তাদের সবাই প্রকাশ্যে আসত না। কারণ, তারা সরকার থেকে বেতন গ্রহণ করত। আনসার বাহিনীর কয়েকজনের নাম মনে আছে, জামালউদ্দীন, আবুল হোসেন ঠাণ্ডু, আবুল হোসেন (অধিনায়ক), আব্দুল হান্নান প্রমুখ। তোফাজ্জল হোসেন ছিলেন আনসার অ্যাডজুটেন্ট। তিনিও যুক্ত হলেন। মোকারম হোসেন জোয়ার্দারও ছিলেন। এরপর প্রশিক্ষণ শুরু হয় প্রকাশ্যে। সকাল হতেই অসংখ্য মানুষ গ্রাম থেকে চলে আসে। তাদের উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

এর মধ্যে আমরা ডামি রাইফেল জোগাড় করি। আমরা আগে সেলুন ভাইয়ের বাড়িতে মিটিং করতাম ঘরোয়াভাবে। কিন্তু এরপর তো প্রকাশ হয়ে যাই। মানুষজন আসে তো আর যায় না। তাদের তো খাবার দরকার। কেউ হয়তো চিড়া-মুড়ি নিয়ে এসেছে। কৃষকের ওই সময় হাতে কাজ ছিল না। ফলে জওয়ান কৃষকরা চলে আসত গ্রুপ করে। সেই চিড়ামুড়ি ভাগাভাগি করে খেত। লক্ষণীয়–আশপাশের বাড়িগুলো থেকে কলস দিয়ে পানি, রুটি নানারকম খাবার আসা শুরু হলো। এই যে খাবার আসছে, কেউ কাউকে বলছে না খাবার আনার জন্য।

এখানে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর কথা বলতে হয়। ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গায়। সেখানে অধিনায়ক ছিলেন আবু ওসমান চৌধুরী, উপঅধিনায়ক আজম চৌধুরী। দুজনই বাঙালি। তারা আমাদের বাধা দিলেন না। বরং পরোক্ষ সমর্থন করলেন। পুলিশের মারমুখী যে মানসিকতা ছিল, তাও বদলে গেছে। শুধু তাই নয়, পুলিশ কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েরাও তো ছিল আমাদের সঙ্গে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তারা ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে সেই সংবাদ আমাদের সরবরাহ করতেন। কখনো আমরাও তাদের বাসায় রাতে যেতাম। তারা সেই অবস্থায় নিজেদের সমর্থনের কথা বলতেন। বলতেন, আমরা প্রকাশ্যে যেতে পারছি না।

২৫ মার্চ রাতে ইপিআর দপ্তরে ওয়্যারলেস মেসেজ এলো। বরিশালের একজন ইপিআর ছিল চুয়াডাঙ্গায়, নাম মজিবুর। তিনি মেসেজ আদান-প্রদান করতেন। তিনি একটা মেসেজ পৌঁছে দিলেন অ্যাডভোকেট ইউনুস আলীর বাসায়। ওই মেসেজটা ছিল ইতিহাসের বিশাল একটা অংশ। আমরা জেনে গেলাম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চলে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। মুখে মুখে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রচার হয়ে যায় শহর থেকে গ্রামে। রাতেই সিদ্ধান্ত হলো ২৬ মার্চ সাড়ে ১০টায় চৌরাস্তার মোড়ে গণজমায়েত হবে। বিশাল সমাবেশ। সেখানে আবার বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হলো। বলা হলো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। মানুষ খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছে। সবাই লাঠি নিয়ে। চুয়াডাঙ্গা যেন মিছিলের নগরী।

“২৫ মার্চ রাতে ইপিআর দপ্তরে ওয়্যারলেস মেসেজ এলো। বরিশালের একজন ইপিআর ছিল চুয়াডাঙ্গায়, নাম মজিবুর। তিনি মেসেজ আদান-প্রদান করতেন। তিনি একটা মেসেজ পৌঁছে দিলেন অ্যাডভোকেট ইউনুস আলীর বাসায়। ওই মেসেজটা ছিল ইতিহাসের বিশাল একটা অংশ। আমরা জেনে গেলাম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চলে এসেছে”

২৬ মার্চ আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজে। সেখানে জিলা স্কুলে ক্যাম্প করা হয়েছে। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে তিনি বিকল্প পথে চুয়াডাঙ্গা চলে এলেন। তখনও ঝিনাইদহে আর্মি আসেনি। ২৭ মার্চ আবু ওসমান চৌধুরী প্রকাশ হয়ে পড়লেন। তিনি চৌরাস্তায় সংগ্রাম পরিষদের সভায় নিজের সমর্থন ঘোষণা করলেন। এই সমাবেশে এমএনএ ও এমপিএরাও এসেছেন। জনসমাবেশেই ঘোষণা করা হলো কুষ্টিয়া মুক্ত করতে হবে। আসহাবুল হকের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি করা হলো। ডাকবাংলোয় সিনিয়রদের বৈঠক হতে থাকে। আনসার, মুজাহিদ, অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, ট্রাক মালিকদের ডাকা হলো বৈঠকে। মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত হয় সংগঠন। দু-তিনদিন প্রস্তুতি নিয়ে কুষ্টিয়া দখলমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করা হয়।

৩ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় বিমান হামলা হয়। সেখানকার ইপিআর ক্যাম্পের দক্ষিণে পরিত্যক্ত একটা বাড়িতে টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সুন্দর মিয়ার ছেলেরা বিদেশ অবস্থান করায় দোতলা বাড়িটি পরিত্যক্ত ছিল। কাছেই জ্বালানি তেলের সংগ্রহাগার ছিল। আমবাগান ছিল সেটা। হেডকোয়ার্টারে বোমা হামলা করলেও কাজ হলো না। ওই সময় বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালিও ছিলেন চুয়াডাঙ্গায়। জার্মানির টেলিভিশনের আরেক সাংবাদিকও ছিলেন। ভারতের অমৃতবাজার পত্রিকার গৌরকিশোর ঘোষ, স্টেটসম্যান পত্রিকার মানস ঘোষসহ অনেক সাংবাদিক চুয়াডাঙ্গায় আসেন। আরও অনেকেই ছিলেন।

ওসি ছিলেন মনিরুজ্জামান। সে ছিল পাকিস্তানি চর। যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানিদের। কন্ট্রোল রুমের ম্যাপ সরবরাহ করেছিল তারা। তাছাড়া ট্রাক ড্রাইভার ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়। শ্রমিকরা ঘোষণা করল—ওসির বিচার না হলে কেউ মুক্তিফৌজের সহযোগিতা করবে না। বিরক্তিকর অবস্থা তৈরি হয়। এর মধ্যে ছাত্রলীগও শ্রমিকদের পক্ষ নেয়। এ নিয়ে মিছিল শুরু হয় ওসির বিরুদ্ধে। সেলুন ভাইও আসেন আমাদের নেতা হিসাবে। কিন্তু আসহাবুল হক সাহেব বললেন, এই সময় এটা নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি কর না।

ওসি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যায় এমন কাজ বাড়িয়ে দেয়। এখানে বলে রাখা ভালো, এই এলাকার বিহারিরা অনেকেই আন্দোলনের পক্ষে ছিল। ব্যয় নির্বাহে সহযোগিতা করেছে। পতাকা বানানোর জন্য শত শত গজ কাপড় কিনে দিয়েছে। কিন্তু মনিরুজ্জামান রাতে বিহারিদের ধরে এনে টাকা আদায় করতে শুরু করে। যা সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মনিরুজ্জামান আসলে বিহারিদের খেপিয়ে তোলার জন্যই কাজটা করেছিল। তখনও সাধারণ মানুষ বিহারিদের শত্রু ভাবেনি। মনিরুজ্জামান অপচেষ্টা চালিয়ে বিহারি আর বাঙালির মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে সক্ষম হয়।

এর আগে তাজউদ্দীন আহমেদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম ও আরেকজন ছিলেন, তারা এলেন ঝিনাইদহ হয়ে চুয়াডাঙ্গা। ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেব চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর গেলেন, আবার ফিরে এলেন। ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে এখান থেকেই আলোচনা হয়। তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে ভারতে যাব। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসাবে আমাকে গ্রহণ করলেই শুধু আমি ভারত যেতে পারি। বিএসএফ-এর গোলক মজুমদার দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সীমান্ত থেকে তাজউদ্দীন সাহেবকে ভারত গ্রহণ করে। এগুলো তো প্রকাশ হয়ে গেছে। ভারতীয় পত্রিকাগুলো এসব খবর প্রকাশ করে দেয়। এসব কারণে পাকিস্তানিদের কাছে চুয়াডাঙ্গা হয়ে পড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

পাকিস্তানিরা যশোর সেনানিবাস থেকে প্রস্তুতিসহ চুয়াডাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসে। তখনও বরিশাল থেকে শুরু করে বিশাল এলাকা ছিল মুক্ত। ১২ অথবা ১৩ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা আবার পাকিস্তানিদের দখলে চলে যায়। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসতে থাকে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে। পাকিস্তানিরা ঢুকে পড়ছে।

প্রত্যেক মানুষ তখন যোদ্ধা হয়ে যায়। প্রতিটি প্রতিরোধ এলাকায় হাজার হাজার মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তাদের হাতে লাঠি। কোথাও পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকও কিছু ছিল। বাকি হাজার হাজার মানুষ লাঠি নিয়ে হাজির হয়। মনে হয়, পাকিস্তানিদের এই লাঠি দিয়েই খতম করে দেওয়া হবে। হাজার হাজার মানুষ জয় বাংলা, জয় বাংলা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দেয়।

এই ইপিআর ও যোদ্ধাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হতো সাধারণ মানুষকে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে সবজি সংগ্রহের। কোথা থেকে জোগাড় করি? সরোজগঞ্জ পেরিয়ে একটা খামার ছিল। ট্রাক নিয়ে গেলাম সেখানে। খামারের ম্যানেজার বলল, এর আগেই খামারের সব সবজি নিয়েছে। এখন তো আমাদের খাওয়ার সবজিও নেই। সত্যিই তাই। তারপর বাড়ি গেলাম। কয়েকজনকে বললাম। তখন তারা বললেন, কাঁচা কাঁঠাল নিয়ে যাও। ওইদিন ছিল বৃহস্পতিবার। গ্রামের মানুষ বৃহস্পতিবার কোনো কাঁঠাল পাড়ে না। তাদের ধারণা, বৃহস্পতিবার কাঁঠাল পাড়লে গাছ মরে যায়। বলল, রাতটা যাক তাহলে মানুষ সবাই কাঁচা কাঁঠাল পেড়ে দেবে। সেগুলো দিয়ে সবজির কাজ করা যাবে।

শুক্রবার ছিল সরোজগঞ্জের হাটবার। দেখি মাঠ দিয়ে রাইফেলধারী অনেক মানুষ যাচ্ছে। খাকি পোশাক পরা। মনে হলো আর্মি। মানুষ হইহই করে রওয়ানা হলো। সবার হাতে লাঠি। কাছাকাছি হতেই দেখা গেল, আর্মিরা হাত উঁচিয়ে ইশারা করছে। তাড়াতাড়ি বললাম আরে এরা তো বাঙালি। তখন সবাই দৌড়ে গেল তাদের কাছে। হ্যাঁ, এরা সবাই আমাদের ইপিআর। বিধ্বস্ত চেহারা তাদের। কয়দিন খায়নি কে জানে। এ অবস্থা দেখে কেউ কলস নিয়ে এলো। যে যা পারে খাবার নিয়ে আসছে। তারা বললেন চুয়াডাঙ্গা যাবেন। মেইনরোড এড়িয়ে কীভাবে চুয়াডাঙ্গা যাওয়া যায়, তা যেন দেখিয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরের পর একজনকে দেখা গেল ঝিনাইদহের দিক থেকে আসছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে। ডজ গাড়িতে করে। গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ঠেলা দিতে হলো। বিকট শব্দ হচ্ছিল। দূরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না কীসের শব্দ। এর মধ্যে দূর থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। হায়, কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল বাজারের মধ্যে গুলি এসে পড়ছে। শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি। গুলির শব্দও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাজারে দোকানিরা যে যেভাবে পারে দৌড়াতে থাকে। জিনিসপত্র, টাকাপয়সা কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। সরোজগঞ্জ বাজারটা বিশাল। কয়েক থানার মানুষ আসে এখানে। এখানে-ওখানে লাশ পড়ে আছে। আমিও পালাই। বাবা ছিলেন আমার সঙ্গে। তিনি গেলেন একদিকে, আমি আরেকদিকে। সন্ধ্যার আগে বাজারে আবার এলাম। বাবার খোঁজে। লাশগুলোর মুখ দেখছি আর বাবাকে খুঁজছি। এত লাশ কাউকে চিনি, কাউকে না। দেড়শর বেশি মানুষ। একসময় একজন বলল, তোমার বাবা ওইদিকে দৌড়াচ্ছেন দেখেছি। আমিও ওইদিকে গেলাম। দূরে আমার চাচাতো বোনের শ্বশুরবাড়ি। সেই বাড়িতে যাওয়ার পর শুনলাম বাবা এখানে এসেছিলেন। তিনি বাড়িতে গেছেন। সেখান থেকে বাড়িতে চলে যাই।

বাজারে পাওয়া লাশগুলো আত্মীয়স্বজনরা নিয়ে তাদের কবরস্থানে দাফন করেছে। ১০-১৫জনের লাশ নেওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজন আসতে পারেনি। তাই পরদিন সেই লাশগুলো একটি বড়ো গর্ত করে সেগুলো একসঙ্গে দাফন করা হয়।'

লেখক: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও সিনিয়র সাংবাদিক

প্রবন্ধ

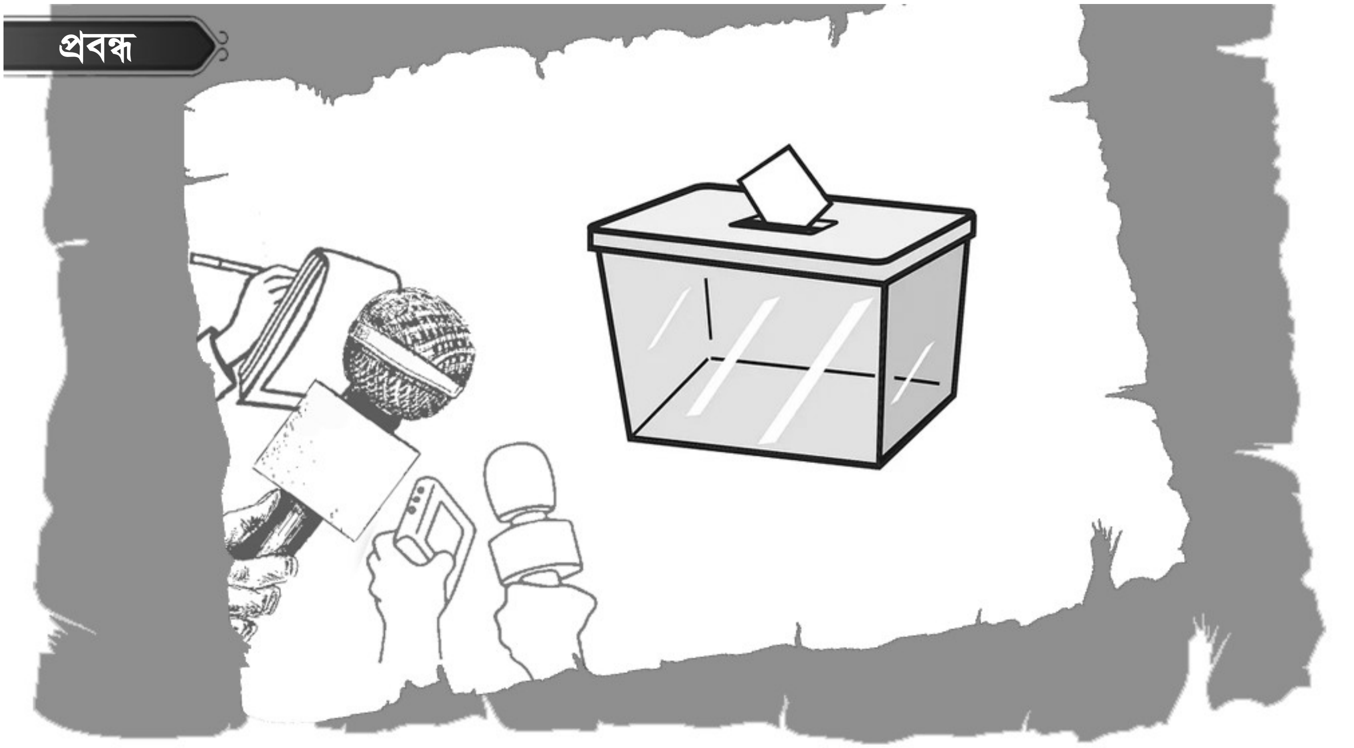

জনমনে নির্বাচনি সংস্কৃতির ধারণা তৈরি করে গণমাধ্যম

জুলফিকার আলি মাণিক

নিজের অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে শুরু করছি। ১৯৯০ সালে সাংবাদিকতা পেশায় কাজ শুরু করি। তখন দেশে উন্মাতাল রাজনীতি। দ্বিতীয় অবৈধ সামরিক শাসক ও স্বৈরাচারী খ্যাত প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন তুঙ্গে। নয় বছর শাসনের পর এরশাদের পতন হয় ওই বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হলে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রধান বিষয় হয়। তখন আমি সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ'-এ শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক। 'অ্যাসাইনমেন্ট'ভিত্তিক ছোটো ছোটো কাজ করে সাংবাদিকতার 'অ, আ, ক, খ' শেখার চেষ্টা চলছিল আমার। সেই চেষ্টার সময়টি ছিল বিভীষিকাময়। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মনের গভীরে শঙ্কা কাজ করত। মনে হতো পত্রিকার দায়িত্বশীলরা এই বুঝি আমাকে বলে দেবেন, 'তোমাকে দিয়ে সাংবাদিকতা হবে না, তুমি চলে যাও।' কিছু একটা কাজ জমা দেওয়ার পর দুরুদুরু বুকে মহা উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকতাম সম্পাদনা বিভাগের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। সব সময় নিজের মধ্যেও অনিশ্চয়তা কাজ করত–'আমাকে দিয়ে সাংবাদিকতা হবে তো? আমি কি সাংবাদিক হতে পারব?'

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ তখন একদল তারুণ্যদীপ্ত (যারা মূলত ছাত্রছাত্রী) সাংবাদিক তৈরি করতে চেয়েছিল। একশর কম সদস্যের তরুণ দলের তরুণতম সদস্য ছিলাম আমি। শুরুতে আমাদেরকে মূলত বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ে জরিপ করতে দিত। প্রায় প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক (খবরের কাগজে কর্মরত অথবা তাদের

কলাম লেখক) আমাদের কাজ বুঝিয়ে দিতেন। এসব করতে করতে ১৯৯১ সালের শুরুতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলে আসে। আমাদের নির্বাচনি রিপোর্টিংয়ের কাজ দেয়। প্রত্যেকের আবাসস্থল বিবেচনায় নিয়ে কাজের এলাকা ঠিক করা হয়। ভোটের দিন আমাদেরকে নিজেদের এলাকার ভোটকেন্দ্রগুলো ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছিল। আমাদের শিক্ষানবিশ সাংবাদিক দলের কোনো সদস্যেরই তখন ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ঢোকার জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি কার্ড ছিল না। ফলে ভোটকেন্দ্রের বাইরে সরেজমিন ঘুরে পাওয়া তথ্য নিয়ে আমাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। ভোট শেষ হওয়ার পরদিনই আমরা প্রতিবেদন জমা দিই। এ ধরনের প্রতিবেদন কীভাবে লিখতে হয়, সে ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই তখন আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। ফলে নিজের চিন্তায় যা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সেসব নিয়ে লিখেছি। আমাদের নির্বাচনি রিপোর্টিংয়ের এ কাজটি তদারকির দায়িত্বে ছিলেন সেসময় দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক প্রতিবেদক ও সাপ্তাহিক খবরের কলাম লেখক মতিউর রহমান চৌধুরী। তিনি আমাদের জমা দেওয়া লেখাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে ভোটের দিনের মাঠের চিত্র সম্পর্কে একটি সুপাঠ্য সংকলিত প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। খবরের কাগজে রিপোর্টটি প্রকাশের পর দেখি আমাদের মাঠের নির্বাচনি চিত্র নিয়ে রিপোর্টটির শিরোনাম আমার জমা দেওয়া প্রতিবেদনের ভেতর থেকে হয়েছে। যদিও আমাদের শিক্ষানবিশ সাংবাদিক দলের কেউই অন্যের রিপোর্ট সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। প্রতিবেদনটি প্রকাশের আগে আমাদের দলের সঙ্গে মতিউর রহমান চৌধুরীর বৈঠক হয়। সেখানে কেউ একজন মতি ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের দলের কার রিপোর্ট সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। মতি ভাই কারও নাম না বলে শুধু বলেছিলেন, 'যার রিপোর্ট থেকে শিরোনাম হয়েছে।' আমাদের তরুণ সাংবাদিক দলের অন্য কেউ না জানলেও আমি তো জানতাম শিরোনামটি আমার প্রতিবেদন থেকে উঠে এসেছে। শিরোনামের বিষয়বস্তু ছিল–ভোটকেন্দ্রের বাইরে এক প্রার্থীর সমর্থকরা সকালে বিনামূল্যে রুটি দিয়েছে দরিদ্র ভোটারদের, তারা সেই রুটি খেয়ে ওই প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। আমার রিপোর্টিং নিয়ে মতি ভাইয়ের সেই মন্তব্য আমার মনে সাংবাদিক হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে সাহস তৈরি করেছিল। সেই চেষ্টার বয়স এখন ৩৩ পেরিয়ে ৩৪ হওয়ার পথে। এই সময়ের মধ্যে বিচিত্র ধরনের নির্বাচন নিয়ে রিপোর্টিং করেছি।

যে কোনো আঙিনায় রাজনৈতিক চর্চা ও প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড়ো মঞ্চ নির্বাচন। দেশে হরেক রকম নির্বাচন হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা ছিল, তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছিল সবচেয়ে বড়ো, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সবচেয়ে বড়ো 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন'। এরপর বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন তৃণমূলের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আছে ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন নির্বাচন। রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে শিক্ষা, পেশা ও ব্যাবসার জগতেও নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নির্বাচন হয়।

আসলে যেসব নির্বাচন দেশ ও সরকার পরিচালনা কিংবা জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক শক্তি হিসাবে কাজ করে, সেসব নির্বাচনের খবর গণমাধ্যমে বেশি গুরুত্ব পায়। জনগণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন একসময় গণমাধ্যমের জন্য দারুণ গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ছাত্ররাজনীতি একসময় জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক শক্তি ছিল। এর মধ্যে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতি ছিল গোটা দেশের ছাত্ররাজনীতিরও অঘোষিত নিয়ন্ত্রক শক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির আন্দোলন-কর্মসূচির বড়ো শক্তি জোগাত ঢাকা কলেজের ছাত্ররাজনীতি। তাই ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনেরও গুরুত্ব ছিল একসময়। এখন অবশ্য ছাত্ররাজনীতিই নিজের আবেদন হারিয়ে বসে আছে। তাই সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের খবর গণমাধ্যমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ছাত্ররাজনীতির ধার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোও অনিয়মিত এমনকি বন্ধ হয়ে গেছে বললেই চলে। ২৮ বছর পর ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন হয়। গণমাধ্যমে বেশ লেখালেখি চলে কিছুদিন। তবে ডাকসু গুরুত্ব হারানোয় গণমাধ্যমে এর গুরুত্বের জায়গাটিও ২৮ বছর আগের মতো নেই। ২০১৯ সালে একবার হয়ে আবার ডাকসু নির্বাচন নির্বাসনে গেছে। সেটা নিয়মিত হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষেরই কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে একসময় চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ), সুপ্রিমকোর্ট ও ঢাকা আদালতের আইনজীবী সমিতি, প্রকৌশলীদের প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন সংগঠনের নির্বাচনের গুরুত্ব গণমাধ্যমে আগের মতো আর নেই। ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন এফবিসিসিআই এবং গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর নির্বাচনও একসময় গণমাধ্যমে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসাবে প্রকাশিত হতো। কারণ, ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো রাজনীতিতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর বড়ো সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে ক্রমান্বয়ে। বিগত এক যুগেরও বেশি সময় দেশের রাজনীতির চর্চা ও নির্বাচনি প্রতিযোগিতায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন হওয়ায় সেসব ব্যবসায়ী সংগঠনের নির্বাচনের গুরুত্বও গণমাধ্যমে আগের মতো বড়ো নেই। তবে ব্যবসায়ীদের নির্বাচনের খবর এখনো অন্য অনেক গোষ্ঠীভিত্তিক নির্বাচনি খবরের চেয়ে গণমাধ্যমে খানিকটা বেশি গুরুত্ব পায়। কারণ, গণমাধ্যমের নিজের টিকে থাকা ও বাণিজ্যের স্বার্থ ব্যাবসার জগতের ওপর নির্ভরশীল।

সর্ববৃহৎ পরিসর থেকে ক্ষুদ্রতম পরিসরে প্রতিটি নির্বাচনই নিজস্ব নানা নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে হয় বা হওয়ার কথা। অনেক সময় সেগুলোর বিচ্যুতি ঘটলে নির্বাচনের ইস্যু গড়ায় আদালতে। তখনও নির্বাচনকেন্দ্রিক আইনি লড়াইয়ের খবর গুরুত্ব অনুসারে গণমাধ্যমে স্থান পায়। আমি নিজেও আইন-আদালত নিয়ে রিপোর্টিং করার সময় বহু নির্বাচনবিষয়ক মামলা আদালতে গড়াতে দেখি। সেগুলো নিয়েও রিপোর্টিং করেছি। অনেক সময় নির্বাচনকেন্দ্রিক অনেক বিরোধের মীমাংসা আসে আদালতের রায় থেকে। সেগুলোর খবর তখন গণমাধ্যমে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি যেহেতু একজন রিপোর্টার, সেই জায়গা থেকে একটি কথা যোগ করতে চাই, তা হলো–নির্বাচনের মাঠের ঘটনা হোক কিংবা আদালতপাড়ায় নির্বাচনি বিরোধ সম্পর্কিত মামলা হোক, সেগুলো নিয়ে রিপোর্টিং করতে হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের আইন, বিধি, নিয়ম-নৈতিকতা, চর্চা ও তার নির্বাচনি সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা জরুরি। তাহলে গণমাধ্যম স্পষ্ট ও সহজভাবে তার পাঠক-দর্শক-শ্রোতাকে যথার্থ নির্বাচনি খবর ও বিশ্লেষণ দিতে পারবে। কারণ, গণমাধ্যমের নির্বাচনি প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্বাচন নিয়ে এবং সাধারণভাবে নির্বাচনি সংস্কৃতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ধারণা তৈরি করতে থাকে। সেই ধারণা শক্তিশালী করতে থাকে বা তার পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। তাই নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং, বিশ্লেষণ তথা সাংবাদিকতার ব্যাপারে গণমাধ্যমের ভূমিকা কত বিশাল গুরুত্ব বহন করে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রিপোর্টার হিসাবে আরেকটি কথা যুক্ত করে শেষ করছি, তা হলো–নির্বাচনি রিপোর্টিং একজন রিপোর্টারের সাংবাদিকতাকে শানিত করার ও দক্ষতা প্রদর্শনের দারুণ ক্ষেত্র ও সুযোগ; যা কাজে লাগালে তার সুফল শুধু সাংবাদিক ও গণমাধ্যমই পায় না, পায় সাধারণ মানুষও।

লেখক: অনুসন্ধানী সিনিয়র সাংবাদিক

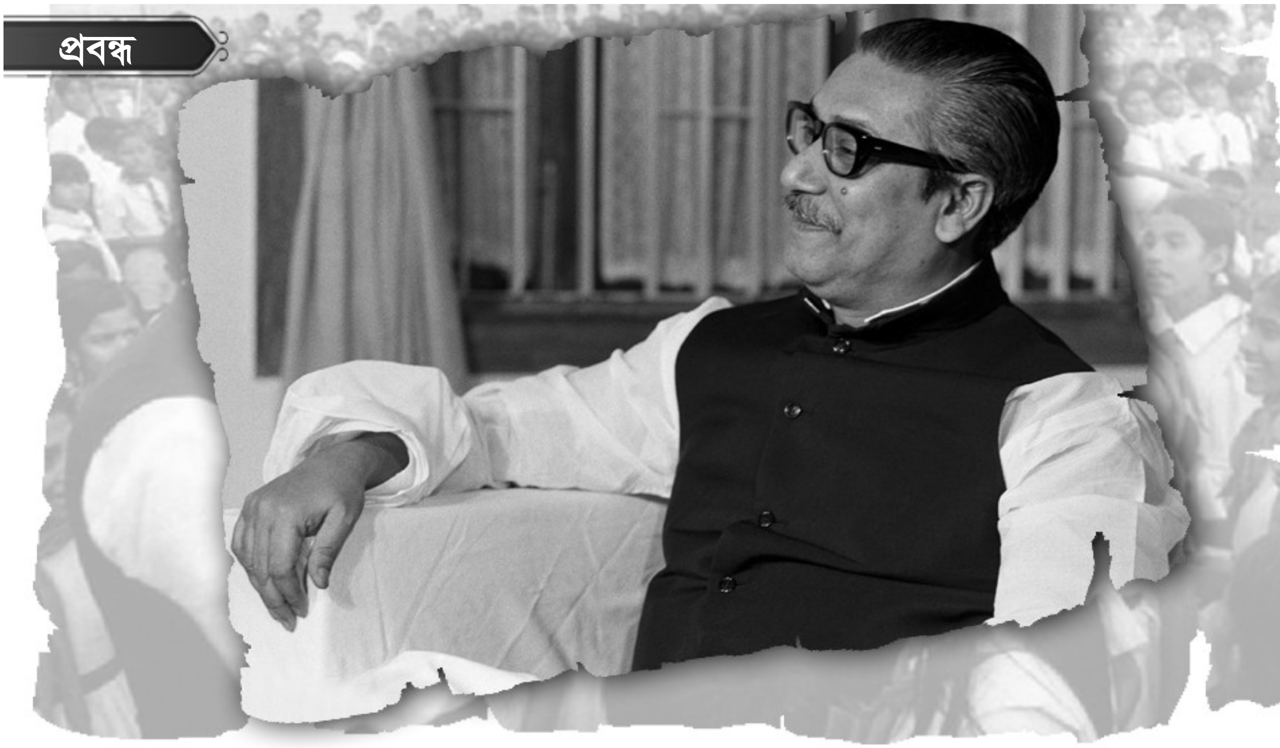

বাঙালির 'সাহস'-এর জন্মদিন ১৭ মার্চ

দুলাল আচার্য

একজন রাজনৈতিককর্মী থেকে নিজের মেধা, প্রজ্ঞা-মননশীলতা ও শ্রমের মাধ্যমে পরিণত হয়েছিলেন একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। এজন্য পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁকে দীর্ঘপথ। যে-পথ পুরাটাই ছিল বন্ধুর। শতসহস্র বাধা পেরোতে পায়ে বিঁধেছে কাঁটা, ঝরেছে রক্ত। তবু পথচলা থামেনি, গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনো আপসও করেননি। যাঁর মানবপ্রেম ও সাহসিকতা বাঙালির হৃদয়ে গেঁথে আছে নিবিড়ভাবে। ৫৫ বছরের জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগার ছিল যাঁর ঠিকানা। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে দু-দুবার তাঁকে হত্যার চেষ্টাও হয়েছিল। সেই অন্ধকার সময় পেরিয়ে আলোর দিশা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির 'সাহস' তিনি। তাঁর সংগ্রামী জীবন, বিশেষ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির বৈষম্য-নীতি, শোষণ ও অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তেজোদীপ্ত নেতৃত্বের কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পেরিয়ে সত্তরের নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। তাঁর নির্দেশনায় ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে। জন্ম হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধু এমন এক নেতা, যিনি বাঙালিকে দিয়েছেন একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি সংগীত, একটি ভূখণ্ড–যার নাম বাংলাদেশ। বাঙালির হৃদয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি। তিনি বাঙালি জাতির পিতা।

১৭ মার্চ বাঙালির জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালির জীবনে এক মহা-আনন্দের দিন। সরকারিভাবে জাতির পিতার জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসাবেও পালন করা হয়। বেসরকারি পর্যায়েও নানা কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে। মহান এই নেতার জন্মদিনটি জাতিকে নতুন এক দিশা দেয়। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশুদিবস হিসাবে পালন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, আজকের শিশুই আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিকর। আগামীর দেশ গড়ার নেতৃত্ব তাদের হাতেই। শিশু জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মর্যাদা ও মহিমায় সমৃদ্ধ হোক–এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত চাওয়া। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শও শিশুদের জন্য এক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ১৭ মার্চ প্রথমবারের মতো দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসাবে সরকারিভাবে পালন করা হয়।

১৯২০ থেকে ১৯৭৫ সাল–৫৫ বছরের সংগ্রামী জীবন তাঁর। রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এক রাজনৈতিক সংগ্রামবহুল জীবনের অধিকারী এই নেতা বিশ্ব ইতিহাসে ঠাঁই করে নেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসাবে। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুন। মা-বাবার চার মেয়ে এবং দুই ছেলের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয়। সবার আদরের 'খোকা'। খোকা নামের সেই শিশুটি পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির ত্রাতা ও মুক্তির দিশারি।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়ার হাতেখড়ি তাঁর। ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিশোর বয়সেই বঙ্গবন্ধু সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে কারাবরণ করেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এখানেই সক্রিয়ভাবে ছাত্ররাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় তিনি বিএ পাশ করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। যার মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে অন্যতম ছাত্রনেতায় পরিণত হন।

খোকা থেকে মুজিব এবং বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পথ মসৃণ ছিল না তাঁর। এজন্য ইতিহাসের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁকে। জেল-জুলুম আর নির্যাতনের সিঁড়ি বেয়ে এগোতে হয়েছে। মুজিব বড়ো হয়েছিলেন স্বীয় প্রতিভায়, তেজে, সাহসে, ভালোবাসায় ও অঙ্গীকারে। সমাজের দুর্বল মানুষের প্রতি শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মুজিবের কৈশোরের সেই অঙ্গীকার এবং এর প্রতি বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ন ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেও শ্রেণি অবস্থান বদল হয়নি তাঁর। পরিবর্তন ছিল না চলন-বলনে। নিজের নতুন জামা অন্যকে দান করা এবং নিজেদের গোলার ধান ক্ষুধার্তদের বিলিয়ে দেওয়া কিশোর মুজিবের মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা ও মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক ছাত্রদের দাবি আদায় তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। গোপালগঞ্জের কৃষক আন্দোলনেও তাঁকে পাওয়া গেছে অগ্রণী ভূমিকায়। কলকাতায় গান্ধীর কুইট ইন্ডিয়া, নেতাজি সুভাষ বসুর হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙা, ছেচল্লিশ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ডা. বিধান রায়ের বাড়িতে হামলা চালালে তা প্রতিহত এবং পাহারা দেওয়া, কলকাতা মাদ্রাসা ও লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে লঙ্গরখানার দায়িত্বে ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪১ সালে শেরেবাংলাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল নামিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে মুজিব ফরিদপুর জেলার নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করেন সফলভাবে।

ঢাকায় শুরুতেই মুজিবকে পাওয়া গেল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পটভূমি সৃষ্টিতে। ১৯৪৭ সালে গঠিত হলো গণতান্ত্রিক যুবলীগ। ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ। ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন জেলে বসেই নির্বাচিত হলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে পিকেটিংরত অবস্থায় বন্দি হন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের আন্দোলন সমর্থনের কারণে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। মুচলেকা দেননি, তাই ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে সেখানেই।

শুরু হয় জীবনের অনন্য আরেক অধ্যায়। বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলন। আবারও বন্দি দীর্ঘদিন। ১৯৫০ সাল থেকে দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন তিনি। ছাড়া পান ১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে মুক্তি পেলেন, তাঁদের ত্যাগ মুজিবকে আরও সাহসী ও গতিশীল করে তোলে। চুয়ান্নর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুজিবের শ্রম বৃথা যায়নি। সেবার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় হয়। যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হলে শেখ মুজিব মন্ত্রী হন। একপর্যায়ে মন্ত্রিত্ব না দলের দায়িত্ব–এ দুটির একটির মধ্যে তিনি বেছে নেন দলীয় নেতৃত্ব; যা এই অঞ্চলের রাজনীতির জন্য একটি দৃষ্টান্ত। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উপেক্ষা এবং প্রদেশের নাম 'পূর্ববঙ্গ'কে পূর্ব পাকিস্তানকরণের প্রতিবাদে গণপরিষদ ত্যাগকারী মুজিব তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার দাবিতে পল্টনে এক জনসভায় তাঁর রাজনৈতিক গুরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। এমনকি সেই সন্ধ্যায় সার্কিট হাউজ চত্বরে নাগরিক সংবর্ধনায় নেতার সামনে প্রতিবাদের ভাষা ছিল– 'একজন লোক প্রধানমন্ত্রী হলো আর স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলাম, এটা মেনে নেওয়া যায় না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যেন না ভাবেন যে, তাঁকে বাংলার সোল এজেন্সি দিয়ে দিয়েছে। নেতাকে সতর্ক হতে অনুরোধ করছি।'

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে চারদিনের মধ্যে শেখ মুজিবকে বন্দি করলেন। রাখলেন দেড় বছর। ১৯৬১ সালে মণি সিংহ, মানিক মিয়া, খোকা রায়দের সঙ্গে এক বৈঠকে মুজিব বলে ফেললেন, 'ওদের সাথে আর থাকা যাবে না। স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে হবে।' সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আইয়ুবের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যও নেতা কেবল মুজিবই। তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে একধাপ এগিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করলেন। বন্দি রাখলেন দীর্ঘদিন মুজিব এবং তাঁর প্রায় সব অনুসারীকে। পাঁয়তারা করলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি দিতে। জনগণ মাঠে নামল। শেষে জনতার সাহসের কাছে অস্ত্রের পরাজয়। মুজিব মুক্তি পেলেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পল্টনে শেখ মুজিবকে দেওয়া হলো 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি। আর ক্ষমতা ছাড়তে হলো আইয়ুবকে।

এরপর তিনি আর শুধু মুজিব নন, বঙ্গবন্ধু। কৃতজ্ঞতার এ ঋণ শোধ করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেখ মুজিব আইয়ুবের উত্তরাধিকারী ইয়াহিয়ার কাছ থেকে প্রথমেই দুটি জিনিস আদায় করে নিলেন। প্যারেটির (পূর্ব ও পশ্চিমের সমান প্রতিনিধি) পরিবর্তে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং জনগণের ভোটে নেতা নির্ধারণ। কৌশলে মুজিব জয়ী হলেন। সত্তরের নির্বাচনে জনগণ পাকিস্তানের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ১৬৯-এর মধ্যে ১৬৭টিতে মুজিবের দল আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে। এ বিজয় শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, সমগ্র পাকিস্তান শাসনের অধিকার পান তিনি। পাকিস্তানিরা 'বাঙালি নেটিভ' দ্বারা শাসিত হওয়া মেনে নেয়নি। সাহসী মুজিব অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দুর্বল অবস্থানে দাঁড়িয়ে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল বের করেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ঘোষণা করলেন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ। ৭ মার্চ শত্রুর কামান ও বন্দুককে উপেক্ষা করে ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য জনগণের 'মুক্তি ও স্বাধীনতার' সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন। বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি নির্দেশ দেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' বঙ্গবন্ধুর সাহসী এই নির্দেশ বীর বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

“ইতিহাস থেকে কাউকে মুছে ফেলা যায় না। কেউ কারও স্থান দখল করতে পারে না। আর বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাঁর কাছাকাছিও যাওয়া সম্ভব নয়”

গান্ধীর অসহযোগ সফল হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এমনকি ফরাসির বাস্তিল দুর্গের পতন, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মাও সেতুং-এর লংমার্চ–এসব ঘটনার চেয়েও ব্যতিক্রম কৌশল ছিল ৭ মার্চের আন্দোলন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শত্রুরা যখন মুজিবকে বন্দি করে, তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে– 'This may be my last message: from today Bangladesh is Independent.' আর মুজিব সৈনিকরা তখন মুক্তাঞ্চলে, প্রতিরোধে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ গঠন করেন মুজিবনগর সরকার। তৈরি হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। মুজিবনগর সরকারের বিচক্ষণতায় ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈনিক রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দেশ পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয়। মুক্ত স্বদেশে ফিরে মুজিব মাত্র তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনীকে ফেরত পাঠানো, বিদেশি সৈন্য অবস্থানকালেও বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশের স্বীকৃতি আদায়, ১০ মাসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণয়ন, বিদেশি প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই মাত্র তিন বছরে সীমাহীন আর্থিক সংকট মোকাবিলা এবং দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে আনতে সক্ষম হন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় এসে বঙ্গবন্ধু দেখলেন কলোনিয়াল রুল দিয়ে রাজার মতো দেশ শাসন করা যায়; কিন্তু দুঃখী মানুষের কল্যাণ আসে না। তাই তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু হয় বিশ্বের শোষিত মানুষের পক্ষে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন এবং বাস্তুচ্যুত ও অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, এক বছরের মধ্যেই জাতি একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান পেল, অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু সময়টা অনেক বদলে গিয়েছিল। স্বাধীন দেশে মানুষের প্রত্যাশা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিল হচ্ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে। বৈরী আবহাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কারণে দেশে দেখা দেয় মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষাবস্থা। এ সংকট যখন কাটিয়ে ওঠেন, তখনই আন্তর্জাতিক এবং স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যা করা হয়। এর নেতৃত্বে কারা ছিল, সে ইতিহাস আজ জাতির কাছে অজানা নয়।

এ কথা সত্য যে, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়টা নতুন প্রজন্মের অনুধাবন করা কষ্টকর। কারণ, পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ নতুন প্রজন্মের কাছে চিন্তার দূরত্ব অনেক। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল, হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করল, আইন দ্বারা বিচারকাজ বন্ধ করল, পাকিস্তানের আদলে বাংলাদেশ গড়তে চাইল–তাদের ব্যাপারে বর্তমান প্রজন্ম কতটুকুইবা জানে? শুধু তাই নয়, তারা ইতিহাস বিকৃত করে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার নানা কৌশলে ষড়যন্ত্র শুরু করল। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিতে নানা কৌশল করেছিল তৎকালীন ক্ষমতা দখলকারী জিয়াউর রহমান ও তার অনুসারীরা। তার আমলেই এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। জারি করা হয় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ।

ইতিহাস থেকে কাউকে মুছে ফেলা যায় না। কেউ কারও স্থান দখল করতে পারে না। আর বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাঁর কাছাকাছিও যাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু ছড়িয়ে আছেন সমগ্র বাংলাদেশে। তিনি আছেন এ দেশের মানুষের হৃদয়ে। শারীরিকভাবে মুজিব নেই সত্য; কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তিনি অমর।

দেশের ১৮ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৭ কোটিই শিশু। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে আমার প্রত্যাশা–শিশুরা যাতে একটি সুষ্ঠু-স্বাভাবিক উপায়ে বেড়ে উঠতে পারে, সেটি নিশ্চিত হোক। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও পিতার মতো শিশুদের ভালোবাসেন। তাঁর সরকার শিশু অধিকার রক্ষায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের আগামী দিনের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন অসামান্য গৌরবের। তাঁর এ গৌরবের ইতিহাস থেকে প্রতিটি শিশুর চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য-পুষ্টির দিকে নজর দিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হোক–জাতীয় শিশু দিবসে এই প্রত্যয় ও প্রত্যাশা।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রবন্ধ

জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব

শাহনাজ পারভীন এলিস

তিন দশকের বেশি সময় বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্বে রয়েছেন নারী। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের নারী নেতৃত্ব এখন প্রশংসিত। এদেশের উন্নয়নের কেন্দ্রেও রয়েছেন নারী। ১৯৯১ সাল থেকে এই দীর্ঘ সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন দুজন নারী–শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত মোট পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন।

জাতীয় সংসদে এবার নিয়ে টানা চতুর্থবার স্পিকারের দায়িত্বে রয়েছেন একজন নারী। তিনি হলেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে তিনি সর্বকনিষ্ঠ স্পিকার এবং প্রথম নারী স্পিকার। এছাড়া বিরোধীদলীয় নেতা, পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সরকারের শীর্ষ অনেক পদে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দিচ্ছেন নারীরা। যদিও বাংলাদেশের তৃণমূল সমাজ এখনো পিতৃতান্ত্রিক আবহেই বিরাজমান। এরপরও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দেশের অর্থনীতিতেও বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ।

সংসদ অধিবেশনে নারী

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৫৩ বছরে বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে ১২টি সংসদ। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। সেই সংসদে ১৫টি সংরক্ষিত আসনে নেতৃত্ব

দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় এদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর পদযাত্রা। এরপর ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ত্রিশে উপনীত হয়। পরে ২০০১ সালের অষ্টম সংসদে সেটি ৪৫ করা হয়। ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের বর্ধিত মেয়াদকাল ও নির্বাচন পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রেখে আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার প্রস্তাব করা হয়। পরে সর্বশেষ ২০১৪ সালের দশম সংসদে সেটি বেড়ে পঞ্চাশে উন্নীত করা হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় রাজনীতিতে বাড়তে থাকে নারীর অংশগ্রহণ। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সাল থেকে সংরক্ষিত আসনের বাইরে সরাসরি রাজনীতির মাঠে ভোটযুদ্ধেও জয়ী হয়ে সংসদে আসছেন নারীরা। সে বছরের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে দেশের ইতিহাসে প্রথমবার নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন খুলনা-১৪ আসনের সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ। এরপর ১৯৮৬ সালে পাঁচজন এবং ১৯৮৮ সালে চারজন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তবে ওই দুই নির্বাচনে কতজন নারী প্রার্থী ছিলেন, সেই সংখ্যা জানা যায়নি। ১৯৯১ সালে ৩৯ প্রার্থীর মধ্যে পাঁচ, ১৯৯৬ সালে ৩৬ প্রার্থীর মধ্যে আট, ২০০১ সালে ৩৮ প্রার্থীর মধ্যে ছয়, ২০০৮ সালে ৫৯ প্রার্থীর মধ্যে ১৯ এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনে ২৯ প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে দশম সংসদের সদস্য স্বামীর মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে তিনজন, স্বামীর ছেড়ে দেওয়া আসনে একজনসহ আরও পাঁচ নারী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন ৬৮ নারী। তাদের মধ্যে ২২ জন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই (দ্বাদশ সংসদ, ২০২৪) ভোটের মাঠে ১ হাজার ৯৬৯ প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৯৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২৮ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৪টি দল ৬৮ নারীকে মনোনয়ন দেয়। আর ২৬ জন ছিলেন নির্দলীয় হিসাবে। ভোটে জয়ী হন ১৯ নারী। পাশের হার সংখ্যানুপাতে পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, গতবারের তুলনায় এবার বিজয়ীর সংখ্যা কমলেও অংশগ্রহণ বাড়ার দিক থেকে এই পরিস্থিতি খুবই আশাব্যঞ্জক। এ বিষয়ে মানবাধিকারকর্মী খুশি কবির বলেন, ‘পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থায় নারীর অগ্রযাত্রার পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ যত বাড়বে, ততই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হবে। কারণ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম-অংশীদারত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীর লড়াই-সংগ্রাম এখনো বিরাজমান। আর সমাজের সর্বস্তরের নারীকে সামনে থেকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারীরা।’

দলীয় রাজনীতিতে নারী

রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে এদেশে নারীর অবস্থান। তারপরও রাজনীতিতে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়া নারীর সংখ্যা এখনো আশানুরূপ নয়। কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থীর সংখ্যার দিকে তাকালে।

নির্বাচন কমিশনের প্রার্থী তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ২৮টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৯৬৯ প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী মাত্র ৯৪ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪টি রাজনৈতিক দলের ৬৮ নারী প্রার্থী আর ২৬ জন নারী মাঠে ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে। দলগত হিসাবে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের ৩৬৩ প্রার্থীর ৭ দশমিক ৬০ শতাংশ নারী। জাতীয় পার্টির ২৬৪ প্রার্থীর ৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ নারী। স্বতন্ত্র ৩৮২ প্রার্থীর ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ নারীপ্রার্থী।

> সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় রাজনীতিতে বাড়তে থাকে নারীর অংশগ্রহণ। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সাল থেকে সংরক্ষিত আসনের বাইরে সরাসরি রাজনীতির মাঠে ভোটযুদ্ধেও জয়ী হয়ে সংসদে আসছেন নারীরা

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে। তবে সংসদে আসা বেশির ভাগ নারীই পারিবারিক সূত্রে রাজনীতিতে আসছেন। তাদের কারও বাবা-মা, কারও স্বামী রাজনীতিক ছিলেন কিংবা আছেন। রাজনৈতিক পরিবারের বাইরে একেবারে তৃণমূল থেকে রাজনীতি করে আসা নারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ঘুরেফিরে পরিচিত মুখদেরই নির্বাচনে বেশি অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন ২০ জন নারীপ্রার্থী। ওই তালিকায় দেখা যায়, ১৭ জনই বিগত একাদশ সংসদের সদস্য। একজন ছিলেন দশম সংসদের সদস্য। বাকি দুজনের মধ্যে একজন ২০০৮ সালের নির্বাচনেও দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন। শুধু ময়মনসিংহ-৩ আসনে নিলুফার আনজুম আগে মনোনয়ন পাননি, সংরক্ষিত আসনের সদস্যও ছিলেন না। তাঁর স্বামী প্রয়াত মাহবুবুল হক শাকিল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী। একইভাবে জাতীয় পার্টির ৯ প্রার্থী মধ্যে ৩জন ছিলেন

সংরক্ষিত আসনের সদস্য। আর জাসদের একমাত্র নারীপ্রার্থী ছিলেন শিরীন আখতার, যিনি বিগত সংসদেও ছিলেন। এছাড়া স্বতন্ত্র ২৬ জনের পাঁচজন বিভিন্ন সময় সংরক্ষিত ও সরাসরি ভোটের সংসদ সদস্য ছিলেন।

বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের ৮১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে বর্তমানে ৭৮ জন সদস্য রয়েছেন। তার মধ্যে নারী মাত্র ২০ জন। ফলে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী ২৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ। আর দলটির ১৯ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলীতে শেখ হাসিনাসহ রয়েছেন চারজন নারী। অন্যদিকে বিএনপির ৫০২ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় নির্বাহী কমিটির তালিকা, স্থায়ী কমিটি ও নির্বাহী কমিটি মিলিয়ে মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ৬৭ জন; যা ১৫ শতাংশের কম। আর জাতীয় পার্টির সব পর্যায়ের কমিটিতে নারী রয়েছেন ২০ শতাংশ।

সংরক্ষিত আসনে নারী

সংসদের সংরক্ষিত আসন নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের। এসব আসনে নির্বাচিত নারীর মর্যাদা, কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। কেউ নারীর ক্ষমতায়নে সংসদের মোট আসন ৪৫০-এ উন্নীত করার পক্ষে। অনেকে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এসব আসনেও সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তাদের মতে, রাজনীতিতে ভোটের মাঠে সরাসরি নারীর অংশগ্রহণ বাড়িয়ে এই সংরক্ষিতব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বাতিল করা যেতে পারে।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ আরও এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত আসন দরকার বলে মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনে লক্ষ্মীপুরের এমপি ফরিদুন্নাহার লাইলী। তিনি বলেন, ‘যেহেতু নারীকে সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে কম, তাই সংরক্ষিত আসন দরকার। প্রতিটি দলে যদি ৩৩ শতাংশ নারী আসতে পারতেন, তখন সংরক্ষিত আসনের দরকার হতো না। তাই আরও কয়েক বছর সংরক্ষিত নারী আসন থাকার দরকার আছে।’

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা মানবাধিকার কর্মী খুশি কবির বলেন, ‘সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী এমপিদের কেউ কেউ সংসদে ও তাদের এলাকায় ভালো ভূমিকা রেখেছেন। সংরক্ষিত নারী আসনের উদ্দেশ্য ছিল সরাসরি ভোটের জন্য নারীদের তৈরি করা। কয়েকজন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য পরে ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে আমি মনে করি, এখন আর নারীদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য না করে তাদের সরাসরি ভোটে নিয়ে আসা উচিত। সংরক্ষিত পদ্ধতি বিলুপ্ত করা দরকার। আর চাইলে আনুপাতিক হারে নির্বাচন করা যেতে পারে।’

অধ্যাপক রেহমান সোবহান মনে করেন, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর নির্বাচিত হতে না পারা অন্যতম একটি সমস্যা। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। সামনের দিনগুলোয় তারা এ বিষয়ে জোর প্রচারণা চালাতে পারেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, নারী-পুরুষে বৈষম্য সমাজে এখনো বিরাজমান। পুরুষ নেতারা নারীকে এগিয়ে যেতে দিতে চান না। অল্পকিছু আসনে ভোটে বিজয়ী হওয়া নারীদেরও তারা অলংকার হিসাবে ভাবার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তারা মনে করেন, নারী নেতৃত্ব দিতে পারবে না, ওই কাজ পুরুষের। অথচ সুযোগ পেলে নারীরা যে রাজনীতিতেও সাহসী ভূমিকা রাখতে পারে–তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তারপরও আমাদের সমাজে, রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। নারীকে রাজনীতিতে এগিয়ে যাওয়ার পথে ধর্মীয়-সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, বিত্তশালীদের পেশিশক্তি ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব–এসব বাধা দূর করা জরুরি।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

পুরো নয় মাস খবরের পেছনে ছুটে শেষ দৃশ্যে থাকতে পারিনি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য

——— সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত; প্রবীণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট। নাড়ির শেকড় তাঁর বাংলাদেশে, তাই পরবাসী হয়েও বাংলাদেশ এবং এদেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আজও অম্লান। একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসাবে ১৯৬৩ সালে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন তিনি। সেখানে প্রায় চার দশকের কর্মময় জীবন তাঁর। ২০০৩ সালে আনন্দবাজারের নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে পেশাদার সাংবাদিকতা থেকে অবসর নেন। আনন্দবাজারে কাজ করতে গিয়ে অর্জন করেছেন বিশাল অভিজ্ঞতা।

এই অভিজ্ঞতার এক অনন্য অধ্যায় একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। একজন তরুণ সাংবাদিক হিসাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি ওই সময় একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রনায়কদের সান্নিধ্য পান। মুজিবনগর সরকার, কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী দপ্তর অরবিন্দ ভবনের কার্যক্রমসহ বহু বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীর সাহচর্যে ছিলেন সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে তিনি অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রবেশ করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আনন্দবাজার গ্রুপ ঢাকা অফিসে তাঁকে দায়িত্ব দেয়। সেই থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর ঢাকায় থাকার সুবাদে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। একাত্তরে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে মহান অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা’ পেয়েছেন কলকাতার এই প্রবীণ সাংবাদিক।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলায়। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তাদের পরিবার ভারতে চলে যায়। সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত পড়াশোনা করেছেন কলকাতায়, সাংবাদিকতায়। পরে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়েও সাংবাদিকতা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। আনন্দবাজারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক পদে কাজ করা ছাড়াও 'বম্বে ব্লিৎস' পত্রিকার ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করেসপনডেন্ট ছিলেন। এছাড়া ছিলেন 'গালফ নিউজ' দুবাই-এর ইন্ডিয়ান করেসপনডেন্ট ও বিবিসি রেডিয়োর কলকাতা করেসপনডেন্ট। নিয়মিত কলাম লিখছেন দেশি-বিদেশি বহু পত্রপত্রিকায়। বর্তমানে সুখরঞ্জন বসবাস করছেন কলকাতার সল্টলেক সিটিতে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছিলেন প্রবীণ এ সাংবাদিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষা'র সঙ্গে। প্রথমে ঢাকা ক্লাব এবং পরে কলকাতায় সল্টলেকে তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন–**বনশ্রী ডলি**

বনশ্রী ডলি: মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে আছে, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: হ্যাঁ। আজ ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকা অফিসে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানে দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার ছবি রাখা আছে।

বনশ্রী ডলি: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সরকার গঠন হলো মুজিবনগরে–এ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা বলবেন?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বাংলাদেশ হওয়ার পর, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। ৭ মার্চ ঢাকার বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...।' এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমদিকেই কলকাতায় পরিচয় হয় আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা–তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মো. কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সঙ্গে। পরে তাঁরা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী হন। তাঁরা কলকাতায় আমার বাড়ির কাছেই এসে অবস্থান করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক তৈরি হলো, এরপর পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের সঙ্গে আমার রোজ দেখা হতো, কোনো কোনোদিন তিন-চারবারও দেখা হতো।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতাসংগ্রামের ঘোষণার ৪০ দিন পর ১৭ এপ্রিল তো মুজিবনগর সরকার গঠন হলো। রিপোর্টার হিসাবে আমার কাজ খবর বের করা। তখন ওই পাঁচ নেতার কাছ থেকে সব খবর পেতাম আর আনন্দবাজারে ছাপাতাম। তখনকার ভারতের সব কাগজকে এসব খবর এনে দিতাম। খবরগুলো এক্সক্লুসিভ।

বনশ্রী ডলি: মুজিবনগর সরকার গঠনের দিন আপনারা কতজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন? সেদিনের অভিজ্ঞতা...

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: দুইশর মতো সাংবাদিক ছিলেন সেদিন, ভারতসহ অন্যদেশ মিলে। ১৬ এপ্রিল ভারতের বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে সব সংবাদপত্রকে জানানো হয় আগামীকাল, ১৭ এপ্রিল সকালে যেন সাংবাদিকরা কলকাতা প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে আসেন। সেদিন কলকাতা ছাড়াও বিশ্বের তাবড় সাংবাদিকরা কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমরা আনন্দবাজারের সাংবাদিকরা সরকারি গাড়িতে না উঠে আমাদের আনন্দবাজারের গাড়ি নিয়েছি। আমাদের গাড়িটা কনভয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। গাড়িতে ছিলেন সম্পাদক ও তৎকালীন ম্যানেজিং এডিটর অভীক সরকার, বরুণ সেনগুপ্ত, চিত্রসাংবাদিক বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত ও আমি। ওই কনভয়গুলোয় ৩০-৩৫টি গাড়িতে ছিলেন বিদেশি সাংবাদিক। নিউইয়র্ক টাইমস, লস অ্যাঞ্জেলেস পোস্ট, ওয়াশিংটন পোস্ট এবং জাপানের চারটি কাগজের প্রতিনিধি, জার্মানি, ইতালিসহ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবাদপত্রের একাধিক প্রতিনিধিও ছিল। আর কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও গেছেন।

আমরা যাচ্ছি তো যাচ্ছি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। কৃষ্ণনগর পার হওয়ার পর বলছে আরেকটু যেতে হবে। এ করতে করতে যখন পৌঁছে গেছি, সেই জায়গাটায় তখন স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে, একটা শামিয়ানা খাটানো। চারদিকে বিএসএফ-এর জোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তখন বুঝতে পারলাম কোথায় এসেছি, কেন এসেছি। এবার অনুষ্ঠান শুরুর অপেক্ষা, কী হতে যাচ্ছে? একটা স্টেজ করা হয়েছে। সরকারি অনুষ্ঠান শুরুর আগে জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে; কিন্তু হারমোনিয়াম কোথায়? বিএসএফ-এর এক জোয়ান তড়িঘড়ি একটা পুরোনো হারমোনিয়াম নিয়ে এলেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘোষণা হলো নতুন বাংলাদেশ সরকার এবার শপথ নেবে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঘোষণা করলেন, আজ এখানে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি সরকার শপথ নেবে। উপস্থিত যারা ছিল হাততালি দিল। প্রথমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু তো প্রেসিডেন্ট, তাই অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন আবু হেনা মো. কামারুজ্জামান। অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী। মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি হিসাবে শপথ নিলেন কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী আর বিদেশমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

বনশ্রী ডলি: শপথ নেওয়ার পর...

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: শপথ নেওয়ার পর তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের বললেন, ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া ও ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেছে। তিনি কোথায় আছেন, তা আমরা জানি না। ৭ থেকে ২৫ মার্চ দখলদার খান সেনারা গোটা বাংলাদেশে গণহত্যা চালায়। এ গণহত্যার ব্যাপারে The News Week পত্রিকা Cover Story করেছিল–The Genocide in Bangladesh অর্থাৎ বাংলাদেশে গণহত্যা। এই News Week-এর খবর পড়ে গোটা বিশ্ব নড়েচড়ে বসেছিল। তারা এসেছিল কলকাতায়। পাকিস্তান সরকার বহু বিদেশি সাংবাদিককে সে দেশ থেকে বের করে দেয়। স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষে যে হিসাব বা তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, দখলদার বাহিনী ৩০ লাখ মানুষ হত্যা করেছে। এ তথ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। মুজিব তনয়া বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ মার্চ দিনটি গণহত্যা দিবস হিসাবে কয়েক বছর ধরে পালন করছেন।

সেদিনের কথা বলি, তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে বললেন, তুমি স্টেজের বাইরে আসো, তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। দুজনই কিছুটা সরে

আসি। আমার কাঁধে হাত রেখে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, সুখরঞ্জন বাবু রিপোর্টে এই জায়গার নামটা দেবেন না। এটা বাংলাদেশের মধ্যে, এটা কুষ্টিয়া জেলার একটা গ্রাম। যদি নাম দেন, খান সেনারা এসে গ্রামটি জ্বালিয়ে দেবে।

বনশ্রী ডলি: বাংলাদেশের জন্য একটা অন্যরকম টান অনুভব করেন?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: হ্যাঁ, পৃথিবীর কত দেশে গিয়েছি। এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় ইংরেজিতে বা অন্য ভাষায় কথা বলতে হয়; কিন্তু এই একটা দেশ, যেখানে আসার পর এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে যে কয়টা দিন থাকি সব জায়গায় বাংলায় কথা বলতে পারি, বাংলা শুনতে পাই। এটা যে কী ভালো লাগে, এই অনুভূতি আছে, থাকবে আজীবন। একথা অনেক জায়গায় লিখেছি। হ্যাঁ, এ বিষয়ে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। চোখে জল আসে। একবার বাংলাদেশে একটি টেলিভিশনের জন্য সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম কলকাতায় বসে। বাংলাদেশে আসার পর সেই সাংবাদিক বলেছিলেন, আপনার চোখে এত পানি আছে! তাকে বলেছিলাম, যেটি আমার জন্মস্থান, যে ঘাটের জল খেয়েছি, আলো-বাতাসে বড়ো হয়েছি, সেটা ভুলি কী করে। অস্বীকার করি কী করে। করবও না কখনো।

বনশ্রী ডলি: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাক্ষী আপনি, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রতিবেদন লিখেছেন, শরণার্থী ও মুক্তিবাহিনীর জন্যও কাজ করেছেন। বিশেষ কোনো স্মৃতি...

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: কত যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, সব তো আজ বলা যাবে না। যুদ্ধ শুরুর পর ইতোমধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এক কোটি লোকের অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলা হয়। ইন্দিরা গান্ধী নিজেও সেসব শিবিরে সফর করেন, শরণার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। প্রতিটি সফরেই আমি সঙ্গী ছিলাম। আর ছিলেন তখনকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আব্দুস সাত্তার। ইন্দিরা গান্ধী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরণার্থীদের জিজ্ঞেস করতেন, কেন এসেছেন তাঁরা? কারা তাঁদের ওপর অত্যাচার করেছে? ইত্যাদি। তখন পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি ও কংগ্রেসের বিজয় সিং নাহারের কোয়ালিশন সরকার। তিনি দিল্লি ফিরে গিয়েই এ কোয়ালিশন সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন। আর ত্রাণের ব্যাপারে দায়িত্ব দেন তাঁর মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশমতো ত্রাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে। বিভিন্ন জেলা শাসকদের পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তখন এক কোটি লোক এসে গেছে। তাদের খাওয়া, পরা, ওষুধ এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোই বণ্টন করে আর তা সরবরাহ করে কেন্দ্র।

১৯৭১-এর এপ্রিলের প্রথমদিকটায় হবে, আমি আর কলকাতার এক ফটোগ্রাফার সীমান্ত পার হয়ে সিলেটের ভেতরের দিকটায় গেলাম খবর সংগ্রহ করতে। মানুষজন খুবই কম। যে যার মতো পালাচ্ছে। যেতে যেতে এক জায়গায় এমন অবস্থায় পড়েছি যে–পাকিস্তান বাহিনী খুব কাছেই এসে গেছে, লোকজনও পালাচ্ছে। গুলি করছে আর আগুন দিয়ে গ্রাম পোড়াচ্ছে। কী করব? রাস্তাঘাট নিজেরা তো চিনি না, একজন দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে, তারা তুলে নিল, আমার সঙ্গে থাকা ফটোগ্রাফার সেই অবস্থায়ও কিছু ছবি তুলতে পেরেছিল। এভাবে সেদিন বেঁচে গেলাম। নাওয়া-খাওয়ার কোনো ঠিক ছিল না। ছুটতে হয়েছে। আরেকদিন সীমান্ত পার হয়ে যেতে যেতে দিনাজপুরের দিকে গেলাম।

পাকিস্তান বাহিনী দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, হত্যা করছে বাঙালিদের। বাঙালিরা যে যেমন পারে প্রতিরোধব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংগঠিত হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সেদিন এক গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটছি, সঙ্গে লোকও আছে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখছি লোকজন আসছে। বলছে, আর যাবেন না, মিলিটারি আসছে; পালান, পালান। হেঁটে, দৌড়ে একটা অফিস ঘরের মতো জায়গায় গিয়ে পৌঁছালাম। তখন পিপাসা আর ক্ষিধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছি। অনেকটা হাঁটতে হয়েছে। আরও লোকজন সেখানে এসেছে। এরই মধ্যে দুই দল লোকের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেছেন, আর কয়েকজন বলছে জিয়াউর রহমান তাহলে কী বলল রেডিয়োতে? আমার কাছে সত্যিটা জানতে চাইছে তারা। বিরক্ত লাগছিল তখন। একটা সময় জোরে বললাম, আগে আমাকে একটু জল দেন, খেয়ে পরে শুনছি আপনাদের কথা। পরে বিষয়টা তারা বুঝতে পেরেছে যে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটা জিয়াউর রহমান কেবল পাঠ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার ডাক দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এমন আরও বহু ঘটনা ঘটেছে সেই সময়টাতে।

যা বলছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববাংলার এক কোটির বেশি লোক ভারতে গিয়েছিল শরণার্থী হয়ে। বিদেশিরা যখন খবর সংগ্রহের জন্য শরণার্থী ক্যাম্পে যেত বিএসএফ-এর ছোটো প্লেনে, আমাকে তাদের সঙ্গে প্লেনে তুলে দিত আমার অফিস। আমি জাপানি, জার্মানদের এন্টারপ্রেটার হিসাবে কাজ করেছি। শরণার্থীরা বাংলাদেশ থেকে কেন গেছে, কী হয়েছে, কী হচ্ছে, বর্তমান সুবিধা-অসুবিধা যতটা বলত আমি তা ট্রান্সলেট করে তাদের বলে দিতাম। এভাবে বুঝিয়েছি বিশ্বকে। আমি তেমন কিছুই না, একজন ছোটো রিপোর্টার তখন। তবে একটা ছোটো ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকার কথা অনেকেই জানে, এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা সেই কলকাতায় গেলে আমার বাড়িতে যান।

আরেকটি ঘটনা ভুলতে পারি না। সেটি জুলাই বা আগস্টে। আমরা যাঁরা যুদ্ধ কাভার করব, তাঁদেরকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হলো। তো ইউনিফর্ম পরতে হতো। ইউনিফর্ম পরে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতাম। সেনাবাহিনী সদস্যরা আমাদের নিয়ে যেত তাদের গাড়িতে। চারবার আমি মরতে মরতে বেঁচে এসেছি। সে অনেক কথা। সব কি আর বলা যায়। একবারের কথা বলি, সেখানে বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী এই যাত্রায় যুক্ত ছিলেন। কামারুজ্জামান, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন। রোজ যেতাম তাঁর অফিসে। তিনি একদিন বললেন, সুখরঞ্জন বাবু একটা উপকার করেন। বললাম, কী উপকার? এই যে আমার হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে আছে এপারে, তাঁদেরকে অস্ত্র তো পাঠাচ্ছি; কিন্তু বিড়ি-সিগারেট ও খাবার জল পাঠাতে পারছি না। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারেন? বললাম, চেষ্টা করছি। তখন তো ল্যান্ডফোন। আইটিসি, ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানি; কলকাতার অফিসের ম্যানেজার ছিল অদিতি সেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দুবছরের জুনিয়র ছিল। ওর অফিসটা কাছাকাছি। ফোন করি, আসব? বলে, এক্ষুনি চলে আসুন। আমি আর যুগান্তরের রিপোর্টার অরবিন্দ/অনিন্দ্য চ্যাটার্জি চলে গেলাম। অরবিন্দ/অনিন্দ্যর বাবার বন্ধু তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। অদিতিকে বলি, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা সিগারেট চাইতে এসেছি, দিতে পারবি? কতগুলো? সে আমাকে বলে, কতগুলো চান। বললাম, যতগুলো দিতে পারিস। বলে কোথায় পাঠাব? অনিন্দ্য বলে, সুখরঞ্জন দার বাড়ির কাছেই বাংলাদেশের কয়েকজন থাকে। সুখরঞ্জনের বাড়ি পাঠালেই হবে। পরদিন ভোর সাড়ে ৫টা পেল্লাই পেল্লাই ট্রাক দাঁড়িয়ে গেছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট নিয়ে। ওপর থেকে দেখে নিচে নেমে এলাম। ট্রাকগুলোকে ঘুরিয়ে আমার পেছন পেছন ওদের বাড়ির সামনে নিয়ে আসি। এসে শুনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বেরিয়েছেন, কাছেই পার্কে হাঁটতে গেছেন। তারা ফিরে আসেন, আমাকে দেখে বলছেন সুখরঞ্জন তুমি এত ভোরে? বললাম, কামারুজ্জামান সাহেব সিগারেট চেয়েছিলেন, এসব ট্রাকে সিগারেট আছে। তখন কামারুজ্জামান ট্রাকগুলো ওই অফিসে পাঠালেন, সেখান থেকে ক্যাম্পগুলোয় ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। ভোরে বেনাপোল ও পেট্রাপোল সীমান্তে যখন পাঠাবে, কামারুজ্জামান বললেন, একটাও গাড়ি নেই। সুখরঞ্জন একটা গাড়ি যদি নিতে পার। আমি আর তুমি যাব, পেছনে ট্রাকে সিগারেট ও জল থাকবে।

পরদিন একটা জিপ গাড়িতে পেট্রাপোল নো ম্যান্স ল্যান্ডের কাছে গেলাম। ড্রাইভারের পাশে কামারুজ্জামান আর আমি। পেছনে সিগারেট ও জলভর্তি ট্রাক। আমাদের গাড়ি এগোচ্ছে, সামনে তিনটা নেড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের এগোতে দিচ্ছে না। চারবার অ্যাটেম্পট নিলাম, কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কামারুজ্জামান বলছেন, এ তো দেখছি বিপদ হলো, এটা অশুভ সংকেত। গাড়ি ব্যাক করো। যখনই গাড়ি ব্যাক করে, দুম দুম আওয়াজ হলো। সামনেই মাইন পোঁতা ছিল, কুকুর তিনটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল! চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখে আমরা কিছুক্ষণের জন্য চুপ! সেদিন আমরা যদি যেতাম, আমরাও সেদিন টুকরো টুকরো হতাম। সেদিন ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন আমাদের। যা হোক, সেদিন বিএসএফ-এর ক্যাম্পে প্যাকেটগুলো রেখে এলাম। বিএসএফ সময়মতো পাঠিয়ে দেবে। এভাবে ত্রাণ দেওয়ার কাজও করেছি।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন যুদ্ধ চলছে, আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম চুয়াডাঙ্গায়। সঙ্গে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান সাংবাদিক। তারা জিজ্ঞাসা করছে, ইজ ইট ইস্ট পাকিস্তান? পিটিআই-এর রিপোর্টার দীপক বসাক বললেন, নো, দিস ইজ বাংলাদেশ। এ নিয়ে দীপক ও ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আমেরিকার সাংবাদিকদের বেশ কথা কাটাকাটি চলছিল। দীপক চিৎকার করে বলল, সাহেব Mustard flower চেন? চোখে ঘষে দেব। অন্যরা দীপককে থামিয়ে দিল।

আরেকটা ঘটনা বলি, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে একটি দেশ স্বাধীন হলো; কিন্তু কীভাবে এলো তা আমরা শুধু রিপোর্ট করিনি, চোখেও দেখেছি। যখন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে। মনে আছে, তৎকালীন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাবু জগজ্জীবন রাম কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করছেন, এর দুদিন আগে ওয়াশিংটন থেকে ঘোষণা করা হয় তারা পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য শিগগির যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে। এ ব্যাপারে বাবুজিকে প্রশ্ন করা হলে নিরুত্তাপ বাবুজি একটু হেসে বললেন, 'ভারতকে লিয়ে সোভিয়েত সে অষ্টম নৌবহর আ চুকা। উনকো আনে দো।' উচিত শিক্ষা দেব। যুদ্ধের পরে বাবুজি ঢাকায় গিয়েছিলেন। তাঁর স্কুল ও কলেজজীবন কেটেছে কলকাতায়। তিনি বাংলায় কথা বলতে পারতেন। তখন আমাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, কলকাতার প্রেস ক্লাবের সেই উক্তি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা ও পাকিস্তান যে ষড়যন্ত্র করেছিল, এর একটি উল্লেখ করলাম মাত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় খবরের অভাব ছিল না। ঘটনারও বিরাম ছিল না।

বনশ্রী ডলি: ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, আপনি কি আগেই খবর পেয়েছেন? পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন আপনি কোথায় ছিলেন, সেদিনের স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা বলবেন?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: এর আগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলি, নয় মাস এভাবে চলার পর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। ভারত কিন্তু যুদ্ধ বাধায়নি। ইন্দিরা গান্ধী সেদিন কলকাতায়। ময়দানে ব্রিগেডে তাঁর জনসভায় সেদিন লাখ লাখ লোক এসেছে বক্তৃতা শুনতে। তিনি কড়া ভাষায় পাকিস্তানকে নিন্দা করেন। আমরা সাংবাদিকরা জনসভার সামনে বসে ছিলাম। খবর এলো, দিল্লি, বোম্বে, লখনৌ, জম্মুসহ বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তান বোমা ফেলেছে। এর মানে, পাকিস্তান ভারতে আক্রমণ করেছে। আমরা জেনে গেছি সেই খবর। আমাদের সিনিয়র দাদা বসুমতীর সাংবাদিক রণেন মুখার্জি বললেন, মিটিং তো অনেকক্ষণ চলবে, আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে কিছুতেই ধরতে পারব না। চলো আমরা রাজভবনের গেটে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি এখান থেকে বেরিয়ে রাজভবনে একবার যাবেনই। তখন যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি। মিনিট পনেরো পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজভবনে ঢুকলেন। তাঁর মুখ্যসচিব নির্মল সেনগুপ্ত একগুচ্ছ টেলেক্স নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে টেলেক্সগুলো হাতে দিতেই তিনি বললেন, তুমি পড়ে যাও। তিনি পড়ে গেলেন–পাকিস্তান গত রাত থেকে শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, দিল্লিসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বোমা ফেলেছে। সিকিউরিটি কড়া ছিল না, আমরা ভেতরে ঢুকতে পেরেছি। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়। তাঁর ডাকনাম মানু। তিনি সিদ্ধার্থদাকে বললেন, মানু আমি আর ওপরে যাব না। এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? মানু এই সুযোগ পেয়ে গেছে। মানু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ওনার গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেছে, আমরাও পেছন পেছন গিয়ে এয়ারপোর্টে ছুটলাম।

“ইন্দিরা গান্ধী সেদিন কলকাতায়। ময়দানে ব্রিগেডে তাঁর জনসভায় সেদিন লাখ লাখ লোক এসেছে বক্তৃতা শুনতে। তিনি কড়া ভাষায় পাকিস্তানকে নিন্দা করেন। আমরা সাংবাদিকরা জনসভার সামনে বসে ছিলাম। খবর এলো, দিল্লি, বোম্বে, লখনৌ, জম্মুসহ বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তান বোমা ফেলেছে”

আগে এয়ারপোর্টে এয়ারব্রিজ ছিল না। ইন্দিরা গান্ধী দ্রুতগতিতে সিঁড়িতে সবে পা দিয়েছেন। আমরা ১৫ থেকে ২০ জন ছিলাম সাংবাদিক। তিনি ওঠার আগে আমি লাফ দিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, পাকিস্তান ভারতকে অ্যাটাক করেছে আর আপনি কলকাতায়, কিছু তো বলছেন না! মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললেন, ক্যান ইউ গিভ মি থ্রি আওয়ারস টাইম। আই হ্যাভ অলরেডি কল দ্য ক্যাবিনেট। আই অ্যাম গোয়িং টু দিল্লি অ্যান্ড অ্যাট ইলেভেন আই উইল কাম টু রেডিয়ো। আমাকে তোমরা তিন ঘণ্টা সময় দাও...। আমরা বলি, ওরে বাবারে। সে কী অবস্থা আমাদের। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেত। অল্প বয়স তখন। সেদিন সাংবাদিক অনিল দা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানেও তুই আমাকে মেরে দিলি? এমন সাহস করতে হয়েছে বা করেছি। এরপর থেকে কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধ হলো। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলো। পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সারেন্ডার করল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

বনশ্রী ডলি: আপনি কি ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: না! ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম না। মানে থাকা সম্ভব হয়নি। পুরো নয় মাস খবরের পেছনে ছুটে শেষ দৃশ্যে থাকতে পারিনি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য। সেদিন কলকাতায় ফরেন ডেলিগেট ও সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের অফিসাররা ব্যস্ত ছিল। আমাকে আর কলকাতার যুগান্তরের প্রতিনিধি অনিল দাকে আর্মিরা সন্ধ্যার সময় বলছে, কুয়াশায় হেলিকপ্টার উড়বে না। আমি রাগে-দুঃখে কষ্ট পাচ্ছি, তখন হেঁটে হেঁটে অফিসে গেলাম। সম্পাদক আমাকে রুমে ডাকলেন। তিনি তো জানেন আমি ঢাকায় এসেছি আবার ফিরেছি। তিনি হেসে জানতে চাইলেন, কীরে কেমন দেখলি? মুখ নিচু করে তাঁকে বললাম, স্যার, আমার যাওয়া হয়নি। কেন? ঘটনাটা বললাম। সম্পাদক তো খুব রেগে গেছেন। তখন ভারতবর্ষের ডিফেন্স মিনিস্টার বাবু জগজ্জীবন রাম; তিনি কলকাতায় বড়ো হয়েছেন, লেখাপড়া করেছেন আমার সম্পাদকের সঙ্গে, তারা একসঙ্গে জেলেও ছিলেন। সম্পাদক বয়স্ক মানুষ, রাগে কাঁপছেন। উনি ফোনটা তুলে বলছেন দিল্লিতে জগজ্জীবনকে ফোন দাও। ফোনে তিনি বলছেন, সুখরঞ্জনকে তুমি চেন? উনি বলছেন, আমি খুব ভালো করে চিনি। তুমি কি জানো এই কাণ্ড ঘটেছে। ওরা ওকে কবে নিয়ে যাবে, জেনে আমাকে জানাও। তিনি তার বন্ধুকে ২০ মিনিট টাইম দিলেন। পরে জগজ্জীবন জানালেন, আজ যাবে না। হেলিকপ্টার কাল সার্ভিসিংয়ে যাবে। রিপেয়ার, ধোয়া-মোছা হবে কাল। পরশু ১৮ ডিসেম্বর সকালে একা সুখরঞ্জনকে নিয়ে যাবে। আর্মির গাড়ি সুখরঞ্জনকে তার বাড়ি থেকে তুলবে, ওরাই পৌঁছে দিয়ে আসবে। পরে তা-ই হয়েছিল।

ঢাকায় এসেছি, কাউকে চিনতাম না। তবে বছরখানেক আগে লন্ডনে পরিচয় হয়েছিল পাকিস্তান অবজারভারের পরে বাংলাদেশ অবজারভারের নিউজ এডিটর লুৎফর রহমানের সঙ্গে। আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তানে কী হচ্ছে, ওর কাছ থেকে আমি শুনতাম। ও আমাকে বোঝাত। আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের কথা ওর কাছে শুনতাম। আমার অফিস থেকে ঢাকায় আসা যখন ঠিক হলো। তখন অপারেটরকে বললাম, ঢাকায় পাকিস্তান অবজারভার অফিসে ফোন করে লুৎফর রহমানকে ধরে দাও। ১০ মিনিটের মধ্যেই বলে লুৎফর রহমান লাইনে আছে। কী করে এত তাড়াতাড়ি? বলি, কোথায় ছিলি, পালিয়েছিলি? বলে, আরে নাহ, শোন, এর মধ্যে আমি একটা কাজ করেছি, পাকিস্তান অবজারভার নাম ছিল, পরশু থেকে কাউকে কিছু না বলে বাংলাদেশ অবজারভার নাম দিয়ে নেমপ্লেট বদলে দিয়েছি। যারা এর মালিক, তারা পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে। শুনে খুব ভালো লাগল। আমার ঢাকায় আসার খবর দিলাম।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম কবে, কোথায় দেখা ও কথা হয় আপনার?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: দেশ তো স্বাধীন হলো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে। আগে থেকেই চার নেতাকে বলতাম, বঙ্গবন্ধু আসার পর প্রথম ইন্টারভিউ আমার চাই। সৈয়দ নজরুল মজা করে বলতেন, সিগারেট দাও, তোমার সব আবদার মেনে নেওয়া হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের জেল থেকে বঙ্গবন্ধু ৮ জানুয়ারি মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি পালাম বিমানবন্দরে আসেন, আমি ছিলাম। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি, শীতের পড়ন্ত বেলায় ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রমনা ময়দানে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়েছিল তাঁদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য। বিমানের দরজা খুলে গেল, বঙ্গবন্ধু নামলেন। বহুল কাঙ্ক্ষিত বাঙালির জাতির পিতাকে নিজের চোখে দেখলাম। বঙ্গবন্ধু সেদিন ভাষণে বলেছিলেন, সকালে দিল্লিতে ইন্দিরাজির কাছে আমি সব শুনে এসেছি। তিনি আরও বললেন, আমার দেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দুরা যাবেন মন্দিরে, মুসলমানরা যাবেন মসজিদে। এখানে কোনো আপস নেই। আপনারা কোনো বেইমানি করবেন না...ইত্যাদি।

এর আগে ২৪ ডিসেম্বর বঙ্গভবনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রেস কনফারেন্স করলেন। সেই প্রেস কনফারেন্সে ওয়ার্ল্ড প্রেস মানে বিশ্বের অনেক দেশের প্রেস প্রতিনিধি ছিল। আমি শেষ সারিতে চুপচাপ বসে আছি। পরের দিকে একটা প্রশ্ন করেছি। তিনি বলছেন, সুখরঞ্জন, তুমি ওখানে কেন। তুমি আসো আসো, সামনে আসো। না, আমি যাব না। পাশে বসা সাংবাদিক ও অন্যরা বলছেন, উনি ডাকছেন কেন যাবেন না? ওনার পাশে যখন বসতে গেলাম প্রায় একশটি ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠেছে। ওখান থেকে খবর পাঠিয়ে বেরিয়েছি যখন, তখন রাত বাজে ১টা। আমরা কী করে ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌঁছাব? কোনো গাড়ি বা যানবাহন নেই। নজরুল ইসলাম সাহেব সরকারের একটা গাড়ি ব্যবস্থা করলেন, নামিয়ে দিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। ইন্টারকন্টিনেন্টালে যখন ঢুকলাম, সিকিউরিটি স্যালুট দিয়ে যাচ্ছে। আগে নিয়াজিদের জন্য এ গাড়ি বরাদ্দ ছিল, ওটাতে আমরা এসেছি, তারা তো মনে করেছে...। মাথা নিচু করে চুপচাপ ঢুকে গেলাম রুমে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশের মাটিতে পা রাখার পর নেতাদের বলেছি, প্রথম ইন্টারভিউ কিন্তু আমি নেব। ওনারা বলেছেন, আগে প্লেন থেকে নামতে দাও। এরপর থেকে রোজ দেখা হচ্ছে, রোজ বলেছি। শুধু অপেক্ষা...। ১৩ জানুয়ারি রাতে কামারুজ্জামান ফোন করে বললেন, শোনো, তোমার সঙ্গে তো অরূপ বাবু আছেন (ওনারা তিনজনই আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন), কাল সকাল ৯টায় হোটেলের এক নম্বর গেটে দাঁড়াবে। বললাম কেন? বলব না, তুমি ওখানে দাঁড়াবে, আমি না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। পরদিন সকাল নটায় দাঁড়িয়ে আছি, ১০ মিনিটের মধ্যে ইউসুফ আলীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আমাকে গাড়িতে উঠতে বললেন। তখনও বলছেন না কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। নিয়ে গেলেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে। আগেই চার নেতা আমার সম্পর্কে বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে। তিনি চিনতেন। যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু বলছেন, আপনারা ঘরে আসুন, দেখুন। তিনি তখন কাঁদছেন। খান সেনারা আমার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল–এইগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। পোড়া বইগুলো আমাদের দেখালেন। অরূপ বাবু আমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে বললেন, বলে দিন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দু-তিনদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু আপনি দেশ স্বাধীন করেছেন,

কাঁদছেন কেন? আপনার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল পাবেন। জোরে বলে উঠলেন, আমি পাব, কবে পাব?

তখনও দুদেশের মধ্যে প্লেন চালু হয়নি। একটি ডাকোডা এয়ারক্রাফট কলকাতার খবরের কাগজ নিয়ে আসত ঢাকায়। আমাদের অফিস রবীন্দ্র ও নজরুল রচনাবলি প্যাকেট করে এয়ারক্রাফটে পাঠিয়ে দেয়। আমি আর অরূপ বাবু এয়ারপোর্ট থেকে বইগুলো নিয়ে সোজা চলে গেলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ৩২ নম্বরে। বঙ্গবন্ধু তখন লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা, দাড়ি কাটছিলেন। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগুলো কী? বঙ্গবন্ধু আপনার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। খুশিতে সবাইকে ডাকছেন, অ্যাই ওরা কেন এগুলো বহন করছে। তোরা কে কোথায় আছিস, বইগুলো ধরে নিয়ে আয়। আবেগ আর খুশিতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর থেকে ওনার সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। আমি এদেশে আনন্দবাজার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছি, থেকেছি বেশ কিছুদিন। প্রায়ই বঙ্গভবনে বঙ্গবন্ধুর অফিস রুমের বাইরে আগেই গিয়ে বসে থাকতাম। উনি এসে ঘরে নিয়ে যেতেন। অনেক সময় আমাকে বলতেন, এই যে বরিশাল ঘরে চলো। এখনো তাঁদের অনেকে আছেন, তাঁদের কেউ কেউ তখন বঙ্গবন্ধুর সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন। পরের দিকে তারা বলতেন, তুমি আমাদের চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় নষ্ট করো, সময়টা নিয়ে নাও। আমরা ফাইল নিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু উনি তোমার সঙ্গে আলোচনা করেই যাচ্ছেন। অফিসের কাজ দেরি হয়ে যায়, বাড়ি যেতে দেরি হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফেরার পর রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ফেরার বছর খানেকের মধ্যেই সংসদীয় সংবিধান গঠিত হয় এবং তা সংসদের কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলিতে পাশ করানো হয়। এক বছরের মধ্যেই দেশে নির্বাচন ডাকেন। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছি, সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছি, বাঙালিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উল্লাস এবং তাঁর জনপ্রিয়তা।

বনশ্রী ডলি: আপনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কী ধরনের আলোচনা করতেন?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: লিবারেশন মুভমেন্ট, মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে কী হচ্ছিল, মূলত ওই সময়ের অনেক বিষয়ে জানতে চাইতেন। চার নেতা ও ওনার নিজস্ব লোকদের কাছ থেকেও শুনেছেন। তারাই বলেছে আমার কথা, আমি নাকি অনেক বেশি জানি। কারণ, আমি অনেক কাজ করেছি ঘুরে ঘুরে। আমিও জানতে চাইতাম তাঁর পরিকল্পনা কী? বলতেন। কী পরিস্থিতিতে উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তান পর্বে লন্ডনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ওনার দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল। লন্ডনে তারাপদ বসুর ওখানে দেখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর। আমি সেটা জানতাম। তারাপদ বসু আনন্দবাজার লন্ডন অফিসে ১৯৩৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। পরে একদিন ড. তারাপদ বসুর সঙ্গে দেখা হলো আমার।

বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার দুদিন পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হিসাবে যেদিন শপথ নিয়েছেন, শপথের পর টি পার্টি চলছে, গল্প করছে সবাই। আমি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিজের পরিচয় জানিয়ে একটা কার্ড দিয়ে জানালাম, আমি সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি বললেন, ও তাই, আপনি আনন্দবাজারের? আমিও কিছুদিন কাজ করেছি আনন্দবাজারে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার আগে। আপনার লেখা তো অনেক পড়েছি। কোথায় পড়েছেন? লন্ডনে তারাপদ বসুর অফিসে। তারাপদ দার ওখানে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মিলে, আপনারা যা এখানে করেছেন, আমরা লন্ডনে তারাপদ দাকে নিয়ে ইউরোপকে বুঝিয়েছি স্বাধীনতার কথা। আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে পড়তেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়, তাঁর ডাকনাম মানু। পরিচয় শুনে আবু সাঈদ চৌধুরী আমাকে বলছেন, সকালে মানু ফোন করেছিল, আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি, সে খুশি হয়েছে। সিদ্ধার্থ দা প্রসঙ্গে বললেন, মানু তো ক্রিকেট খেলত, খেলা কি ছেড়ে দিয়েছে? ও তো আমাদের সঙ্গে বিএ পরীক্ষা দেয়নি। সিদ্ধার্থ দা পরে ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তো আবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ের সন্তান, সম্পর্কে দেশবন্ধুর নাতি।

বনশ্রী ডলি: মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর লাখ লাখ লোক ভারত যেতে শুরু করে। তাদের জন্য থাকাখাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্পর্ক ভালো না থাকলে তা সম্ভব হতো না। তখন সমগ্র ভারত বলব না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চেয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সরকার যেন তাড়াতাড়ি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে সংসদের উভয় কক্ষে দাবি ওঠে–নতুন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। লোকসভায় এই দাবি তুলেছিলেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি ও ত্রিদীপ চৌধুরী। রাজ্যসভায় দাবি তোলেন ভূপেশ গুপ্তসহ অনেক বাঙালি সদস্য। কিন্তু স্বীকৃতি দেয়নি তখন।

৬ ডিসেম্বর অফিসে ফিরে শুনলাম, সংসদে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি ঘোষণা করছেন। আর শহরজুড়ে মাইকে বাজানো হচ্ছে–আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আরেকটি জনপ্রিয় গান ছিল–শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি...আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/ বাংলাদেশ

প্রায়ই বঙ্গভবনে বঙ্গবন্ধুর অফিস রুমের বাইরে আগেই গিয়ে বসে থাকতাম। উনি এসে ঘরে নিয়ে যেতেন। অনেক সময় আমাকে বলতেন, এই যে বরিশাল ঘরে চলো

আমার বাংলাদেশ...। সেদিন রাতেই থিম্পু থেকে ভুটান সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ঘোষণা করল।

ভারত কিছুটা দেরি করে স্বীকৃতি দিয়েছে এ কারণে যে, ইন্দিরা গান্ধী গোটা পৃথিবীকে নিজের দলে বা পক্ষে নিয়ে পরে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধী কেবল পশ্চিমবঙ্গের রিফিউজি ক্যাম্প ঘুরেননি, পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বিশ্বজনমত তৈরি করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। তিনি ১৯৭১ সালে ৪ বা ৫ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সফররত সাংবাদিকদের দলে আমিও ছিলাম। তিনি ওয়াশিংটনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিক্সনের সঙ্গে দেখা করেন। হাত তুলে তুলে নিক্সনকে বলেছেন, মি. নিক্সন, ডোন্ট সাপ্লাই আর্মস টু পাকিস্তান টু কিল মাই...আই উইল নট অ্যালাউ..., নট সাপোর্ট ইট। তখন তাঁর কথা শুনে নিক্সন মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিলেন, কোনো কথা তখন ইন্দিরা গান্ধীকে দেননি। যতক্ষণ নিক্সনের ওখানে ছিলেন, কোনো খাবার গ্রহণ করেননি মিসেস গান্ধী। দ্রুত বেগে হাঁটতেন, বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে বাসে উঠতে বলে তিনি তার গাড়িতে উঠলেন। আমাদের জন্য বাস রাখা ছিল, সোজা ওয়াশিংটন এয়ারপোর্ট, পরে নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বক্তৃতায় বলেছেন, আমি নিক্সনের কাছে গিয়েছিলাম। আই অ্যাপিল টু দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি। সাপোর্ট মি, অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে বলেছি...। ওসব বলে আবার তিনি আমাদের হাত নেড়ে চলে আসার জন্য বলেন। আবার বাসে করে এয়ারপোর্ট। আমরা তখন টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি; কিন্তু তিনি টায়ার্ড হচ্ছেন না।

খুব সকালে জার্মানির বন শহরে নামলাম। জার্মান চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও একই কথা বলে এসেছেন। জার্মানিতে এক সাংবাদিক ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই স্বাধীনতাকে আপনি সাপোর্ট করেন কেন? ইস্ট পাকিস্তানের বাঙালিকে কেন আশ্রয় দিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী তখন খুব চটে গেছেন, তিনি জবাব দিয়েছিলেন। ইস্ট পাকিস্তান? দিস ইজ বাংলাদেশ, দেয়ার ইজ গভর্নমেন্ট। এরপর তিনি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সঙ্গে কথা বলেছেন। সবার সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। সেই সময়টাতে ভারতও যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খুবই ইন্টারেস্টিং, ৬ ডিসেম্বর তিনি তাজউদ্দীনকে চিঠি লেখেন। আই অ্যাম...দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া রিকোগনাইজ ইয়োর লিবারেশন গভর্নমেন্ট। ব্যস হয়ে গেল।

বনশ্রী ডলি: ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড কখন শুনলেন? এরপরের পরিস্থিতি...

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: একটা কথা বলি, যেদিন বাংলাদেশ হলো, সেদিন হেনরি কিসিঞ্জার, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিল, উইল টেক রিভেঞ্জ। অ্যান্ড দ্যাট ইন্ডিয়ান লেডি। আমি তো আগেই জানতাম হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। হত্যা করা হবে। আমি নিজেই তাঁকে বলতে গেছি। আমাদের ঢাকার আনন্দবাজারের অফিসের কার্যক্রম বন্ধ করে কলকাতায় চলে যাচ্ছি। সেটা হয়ে উঠেনি। আপনি আমার বইয়ে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন।

বঙ্গবন্ধু যেদিন ঢাকায় আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে, সেদিন দিল্লিতেই ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বলে দিয়েছেন। সেদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমার সরকারের বিরুদ্ধে দেশে ষড়যন্ত্র চলছে, আপনারা সাবধানে সতর্ক থাকবেন। ফার্স্ট ওয়ার্নিং দিয়েছেন সেদিনই বঙ্গবন্ধু। ঢাকায় নামার পর অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমি যখন তাজউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটি জেনে গেছি। তখন টেনশনে আছি। একদিন বলেই ফেললাম, আমার একটি কথা আছে। বঙ্গবন্ধু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, কী কথা, আমাকে মারবে তো? সে আমি জানি। আমি জাতির পিতা, কোনো বাঙালি আমাকে মারবে না। আমাকে হেনস্তা করতে পারে, আমিও ওদেরকে হেনস্তা করে নেব। উনি বিশ্বাস করতেন না যে বাঙালি তাঁকে মেরে ফেলতে পারে! ১৫ আগস্ট এর আগে ঢাকায় আমি অফিস বন্ধ করে চলে যাই। তাঁকে জানাইনি। অফিসের সিদ্ধান্তে আমাকে চলে যেতে হয়।

১৫ আগস্ট ভোরে খবর পেলাম, আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক বা সেন্ট্রাল এডিটর জানালেন আমাকে। ততক্ষণে রেডিয়োতে খবর প্রচার হচ্ছে। সবাই জেনে গেছে। প্রায় সব লোক কলকাতার রাস্তায় নেমেছে এই হত্যাকাণ্ডের ধিক্কার জানাতে। রাস্তায় বেরিয়ে গেছি। সারা দিন ঘুরে ঘুরে সব খবর নিলাম।

আরেকটি ঘটনা বলি, বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবে আসেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বিদেশ ও কমনওয়েলথ সচিব বাবু সুবিমল বসু। এ প্রসঙ্গে সুবিমল বাবু আমাকে বলেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী (যাকে তিনি ইন্দু বলে সম্বোধন করতেন) তাঁকে বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই আপনাকেই চাইছেন প্রথম হাইকমিশনার হিসাবে। পরে সুবিমল বাবু সম্মতি দেন। বছর দুই ঢাকায় দায়িত্ব পালনের পর ফিরে যান ভারতে। কারণ, তখন তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়। তেমনটাই কথা ছিল। সুবিমল বাবু চলে আসার পর ভারতের আরেক জাঁদরেল আইসিএস অফিসার সমর সেনকে পাঠানো হয় ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবে। সমর সেন কাজ শুরু করেন ঢাকায়; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সমর সেন তখন কলকাতায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কলকাতাসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। সমর সেন কলকাতায় আটকে যান। ১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট সমর সেন সড়কপথে ঢাকা যান, পেট্রাপোল সীমান্তে আমি তখন উপস্থিত ছিলাম।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশের জাতীয় চার নেতাকেও জেলখানায় হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর। তাঁদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: চার নেতাকে জেলখানায় হত্যা করা হলো, তা ছিল ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এ হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের অবস্থা কী হতে যাচ্ছে, তা অনুমান করতে পারছিলাম। নানা দিক থেকে খবর পাচ্ছি তখন। চার নেতা নিহত হওয়ার পর আমি ও আমার পরিবারকেও এক অন্যরকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল চার নেতার একজন কামারুজ্জামান দেশে ফিরে গেলেন, তার দুই ছেলেকে নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করেন কলকাতায়। আমি তা জানতাম। বড়ো ছেলে খায়রুজ্জামান লিটন, ছোটোজন এহসানুজ্জামান স্বপন। খায়রুজ্জামান লিটন এখন রাজশাহীর মেয়র। ওরা আমার পরিবারের অংশ। ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর ঢাকা কারাগারে চার নেতাকে হত্যা করে। এর কিছুদিন পরেই কলকাতায় তার দুই ছেলেকেও হত্যার জন্য লোক পাঠায় হত্যাকারীর দল। কলকাতায় তারা সুযোগ খুঁজে দুই ছেলেকে হত্যা করার জন্য। সেই খবর এখানকার গোয়েন্দা বিভাগ ও আরও কয়েকজন জেনে যায়। কলকাতার তখনকার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আমার বন্ধু শরবিন্দু চট্টোপাধ্যায় আমাকে ফোন করে বলে যে, ওদের নিরাপদে রাখা দরকার। আমরা ওদেরকে হোস্টেলে রাখা নিরাপদ মনে করছি না। আপনার বন্ধু কামারুজ্জামান সাহেবের দুই ছেলেকে আপনার বাড়িতে নিয়ে রাখুন। তাহলে ওরা নিরাপদে থাকবে। দেরি না করে ওদেরকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। এই বাড়িতে

যেখানে আজ কথা বলছি, আমার স্ত্রী ওদের ভাত মেখে খাওয়াত, যত্ন নিত; কিন্তু ওদের কান্না তো আর থামে না! আমার বাড়ির চারদিকে অলিখিত এক ধরনের পাহারা ছিল। এভাবে বেশ কিছুদিন ওরা আমার বাসায়ই থেকেছে। ওদের কান্নাকাটি দেখে স্ত্রী আর আমি খুব অস্থির হলাম, আমাদেরও মন খারাপ হলো। তখন ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা ইন্দিরা গান্ধীকে বিষয়টি জানান, ছেলে দুটি এখানে কান্নাকাটি করছে, ওরা দেশে পরিবারের কাছে যেতে চাইছে। কিন্তু কীভাবে যাবে? বাংলাদেশে তো খারাপ অবস্থা। ওদের হত্যা করা হতে পারে। তখন ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে কামারুজ্জামানের দুই ছেলেকে বাংলাদেশে সব ধরনের নিরাপত্তা দেয় বাংলাদেশ সরকার। এরপর কামারুজ্জামান সাহেবের দুই ছেলেকে বিশেষ নিরাপত্তায় বাংলাদেশে পাঠানো হয়। ওরা আমার আপনজন।

বনশ্রী ডলি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার কোনো পর্যবেক্ষণ?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত: আজকের বাংলাদেশ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছর পরের বাংলাদেশ। এর মধ্যে কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। এবার দেড় বছর পর ঢাকায় গিয়েছি। ঢাকায় যাওয়ার পর লক্ষ করেছি মানুষ কাজ চায়, উন্নয়ন চায়; যা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা করেছে। ঢাকা ক্লাব থেকে উত্তরা যেতে আগে দেড় থেকে সোয়া দুই ঘণ্টা লাগত। এবার ২০ মিনিটে গিয়েছি, ২০ মিনিটে ফিরেছি। এটা দেখে মনে হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ এ উন্নয়ন অব্যাহতভাবে চাইছে। সেজন্য মানুষ এবারও শেখ হাসিনার দলকে ভোট দিয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছে। কাজ না করলে মানুষ ভোট দেয় না, মানুষ কাজ পছন্দ করে। সব কৃতিত্ব শেখ হাসিনার এবং বাংলাদেশের মানুষের। কারণ তারা শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়েছে। মানুষ বুঝে নিয়েছে। একটা কাগজে খবর বেরিয়েছে যে আরও সাতটি জোনে মেট্রোরেল তৈরি করা হবে। এটাই চাইছে মানুষ, আর চাইছে দুবেলা খেতে। এখানে বেকার সমস্যা কম, সেই তুলনায় ভারতে বেকার সমস্যা বেশি রয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা অনেক বাধা সত্ত্বেও তা করছেন। এটা শেখ হাসিনার সফলতা।

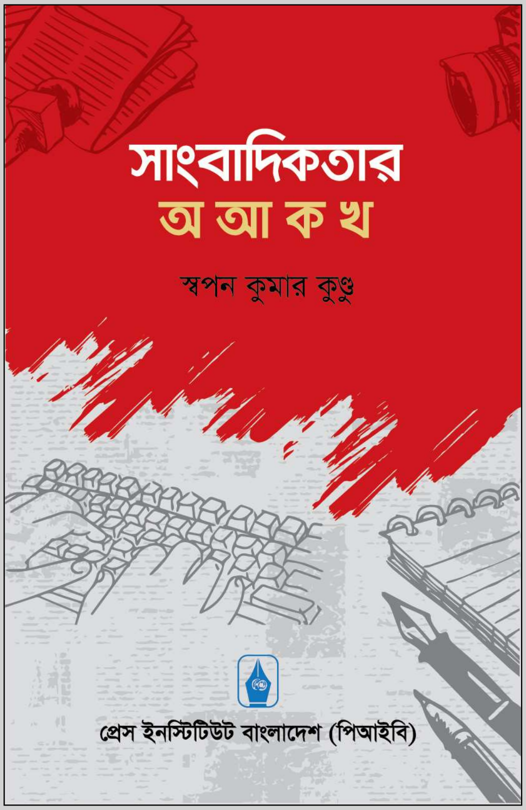

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

সংবাদপত্রে একাত্তরের মার্চ

মিজানুর রহমান

মার্চ ১৯৭১-এর উত্তাল দিনগুলোর নীরব সাক্ষী হয়ে আছে ওই সময়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর সেনা অভিযানের কারণে ঢাকায় পত্রিকা অফিসগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ঢাকা থেকে যে পত্রিকাগুলো বের হতো, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক সংগ্রাম, পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ, দ্য পিপল ইত্যাদি। অভিযানকালে পাকিস্তানি বাহিনীর রুদ্ররোষের শিকার হয় দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও দ্য পিপল। পাকিস্তানি বাহিনী এ তিনটি পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়। এরপর ৩০শে মার্চ ঢাকা থেকে কয়েকটি পত্রিকা বের হয়। তবে সামরিক সরকারের কঠিন সেন্সরশিপের কারণে সত্য ও নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন ব্যাহত হয়। মূলত এগুলো তখন সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের ঔপনিবেশিক নীতি, বারবার অন্যায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করা, শোষণ ও নিপীড়নের ফলে বাঙালিদের মনে যে স্বাধিকার চেতনা দানা বেঁধে ওঠে, তারই কার্যকর প্রতিফলন ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টালবাহানা শুরু করে। ফলে এদেশের মানুষ ফুঁসে ওঠে। এ বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিরই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে ওই সময়কার পত্রপত্রিকায়।

২রা মার্চের পত্রপত্রিকায় ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা প্রচারিত হয়। প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে অর্ধবেলা হরতাল পালিত হয়। ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ৮ই মার্চের পত্রপত্রিকায় এ সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। এ ভাষণে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর থেকে পত্রিকাগুলো প্রতিদিনই অসহযোগ আন্দোলনের খবর প্রকাশ করতে থাকে। ইতঃপূর্বে ৭ই মার্চের পত্রিকায় ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের খবর প্রকাশিত হয়।

২২শে মার্চ ঢাকার প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় 'বাংলার স্বাধিকার' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিটপী অ্যাডভার্টাইজার্স সময়োপযোগী এ ক্রোড়পত্রটির পরিকল্পনা করে। হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন অবজারভার গ্রুপের পত্রিকাগুলো 'বাংলার স্বাধিকার' শিরোনামে ক্রোড়পত্রটি প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরদিন অবশ্য শিরোনামটি বদলে 'বাংলাদেশ' করে ক্রোড়পত্রটি প্রকাশ করে। ক্রোড়পত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলোর লেখক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধুর অন্যতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রেহমান সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুজ্জামান। ক্রোড়পত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর তিন কলামব্যাপী ছবির সঙ্গে হাতে লেখা একটি বাণীও প্রকাশিত হয়।

মার্চের উত্তাল সময়েই সংবাদপত্রগুলোয় বাঙালির স্বাধিকার চেতনা যে স্বাধীনতার চেতনায় রূপ পরিগ্রহ করে তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ছোটো দলগুলোও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান জানাতে থাকে। ২১শে মার্চের পাকিস্তান অবজারভারে ন্যাশনাল লীগ প্রধান আতাউর রহমানের বক্তব্য ছিল: 'Mujib cann't compromise with exploiters'। একই দিনের পত্রিকায় মওলানা ভাসানীর আহ্বান প্রকাশিত হয়: 'Bhasani urges Mujib to declare independence'.

১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ থেকে ২২শে মার্চের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে ছয়বার বৈঠকে মিলিত হন। এসব ঘটনাবলি থেকে এটি প্রতীয়মান হয়, শাসনতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ নেতাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতির জন্য সময় নিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ১৯শে মার্চ জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্তত ২০ জন নিহত হন। এ ঘটনায় দেশের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্টের বার্তা পেয়ে ভুট্টো ২১শে মার্চ ঢাকা আসেন। ২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করেন। ২৩শে মার্চ সারা বাংলাদেশে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৪শে মার্চ ভুট্টোসহ পাকিস্তানি নেতারা ঢাকা ত্যাগ করে। ২৫শে মার্চ দিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুলোক নিহত হওয়ার খবর আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসব গুলিবর্ষণের নিন্দা জানিয়ে এবং ২৭শে মার্চ দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানিয়ে ২৫শে মার্চ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। ২৫শে মার্চ রাতে সামরিক বাহিনীর অভিযানের ফলে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় বিবৃতিটি কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়।

২৬শে মার্চ পাকিস্তান টাইমস 'MUJIB CALLS FOR STRIKE ON 27th: PROTEST AGAINST ARMY OPERATION' শিরোনামে এ সংবাদ পরিবেশন করে।

২৫শে মার্চ রাতে সামরিক অভিযানের পর বেশ কয়েকদিন ঢাকায় কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। ৩০শে মার্চ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পূর্বদেশ, মর্নিং নিউজ ও পাকিস্তান অবজারভার। ৩০শে মার্চ 'মর্নিং নিউজ' মাত্র এক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সেন্সরশিপের কারণে তখন প্রকৃত ঘটনাবলির কোনো উল্লেখ দেখা যায়নি। করাচিতে ভুট্টোর সংবাদ সম্মেলনের দুটি খবর ফলাও করে ছাপানো হয়, যার একটির শিরোনাম: Mujib Wanted Separation Right From '66 এবং Pakistan Saved, says Bhutto. মর্নিং নিউজে ৩১শে মার্চের উল্লেখযোগ্য সংবাদের শিরোনাম ছিল: Major towns countryside continue to be normal. Yahya Returns to Islamabad. Pakistan protests India. Indian plans to support anti-Pakistan movement. Tikka khan meets senior civil servants ইত্যাদি।

২৫ তারিখ থেকে মার্চে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির প্রকৃত চিত্র অবশ্য বিদেশি পত্রিকায়ই বস্তুনিষ্ঠভাবে উঠে আসে। ঢাকায় গণহত্যার খবর ৩০শে মার্চ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিংয়ের প্রতিবেদনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: Some Eye-Witness Accounts: How Dacca paid for a united Pakistan। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়: a neighbour said at 1-10 a. m. one tank, an armoured car and trucks loaded with troops drove down the street firing over the house. 'Sheikh you should come down', an officer called out in English as they stopped outside. (সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড)

২২শে মার্চ ঢাকার প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় 'বাংলার স্বাধিকার' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিটপী অ্যাডভার্টাইজার্স সময়োপযোগী এ ক্রোড়পত্রটির পরিকল্পনা করে

এছাড়া ভারতীয় পত্রপত্রিকায়ও বাংলাদেশে মার্চের গণহত্যার খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয়।

মুক্তাঞ্চলে 'জয়বাংলা' নামে একটি পত্রিকা মার্চেও প্রকাশিত হয়। স্বাধীন বাংলার আদি পর্যায়ে নওগাঁ থেকে ছোটো আকারে এই দৈনিকটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রহমতউল্লাহ। এ পত্রিকার ৩১শে মার্চ ৭১ সংখ্যায় এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে: 'বাংলা মুক্তিবাহিনী পুলিশ-আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। মনে রাখিবেন হয় আমরা জয়ী হইব, নতুবা ধ্বংস হইব। মাঝামাঝি কোন পথ আর নেই।' এই পত্রিকায় কিছু বাণী উদ্ধৃত করা হয়, যা ছিল এরকম: 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ঘরে-ঘরে দুর্গ গড়ে তোল–বঙ্গবন্ধু (ঘোড়দৌড় মাঠ, ঢাকা, ৭ই মার্চ)। 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাও'–মাওলানা ভাসানী (পোলো গ্রাউন্ড, চট্টগ্রাম ২১শে মার্চ)।

আপস ফর্মুলা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং জেডএ ভুট্টোর বৈঠক চলাকালে তৎকালীন পত্রপত্রিকায় যেসব খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সেগুলো থেকে কিছু নির্বাচিত খবর, সম্পাদকীয় এবং শিরোনাম উপস্থাপন করা হলো:

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ ১৯৭১

'শান্তিপূর্ণ, সুশৃংখল নিয়মে আন্দোলন চালাইয়া যান'

আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে।

গতকাল (শনিবার, ২০ মার্চ) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমানের গণআন্দোলন প্রতিটি গ্রাম, শহর ও নগরীর নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলকে বাংলাদেশের দাবীর পিছনে সুসংগঠিত করিয়াছে। বাংলাদেশের জনসাধারণ সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতার প্রিয় মানুষের অন্তর জয় করিয়াছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে একটি অনুপ্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিচালিত এবং ইহা হইতেছে আপন লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসরমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণের সংগ্রামের দৃষ্টান্ত।

জীবনের সকল স্তরের মানুষ–মাঠের কৃষক, কারখানার শ্রমিক, ব্যাংক, অফিস, বন্দর এবং সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ–যাহারা আমাদের নির্দেশাবলীর কাঠামোর মধ্যে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করিয়া যাইতেছেন, আপনাদের সকলের প্রতি আমার অভিনন্দন। এইসব নির্দেশ কার্যকর করার ব্যাপারে ছাত্র, শ্রমিক এবং কর্মচারী সংগঠনগুলির সজাগ দৃষ্টির জন্য তাহারা বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। আমাদের জনসাধারণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের নিজেদের বিষয় অত্যন্ত আদর্শ পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে সক্ষম।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে বদ্ধপরিকর। তাই, মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অবশ্যই অব্যাহত থাকিবে। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখল পদ্ধতিতে জনসাধারণ তাহাদের আন্দোলন চালাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহাদের নিকট ইহাই আমার আবেদন। নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধিমূলক ও উস্কানির বিরুদ্ধে আমি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করিতেছি। আমাদের জনসাধারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর শৃংখলা পালন করিয়া যাইবেন, যাহাতে জনসাধারণের অত্যাবশ্যক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিতে পারে।

গত ১৪ মার্চ ঘোষিত কর্মসূচীর পর যেসব নির্দেশ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে কিংবা আগামীতে হইবে, সেগুলি পালন সাপেক্ষে উক্ত সংগ্রামী কর্মসূচী চালু থাকিবে। আগামী ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে ছুটি থাকিবে।

নির্বাচিত শিরোনাম

* 'মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার অগ্রগতি: সোমবারে চূড়ান্ত বৈঠক?', দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ ১৯৭১
* ভুট্টো আজ ঢাকায় আসছেন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ ১৯৭১
* আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ ৭১-এর তেইশে মার্চের সুর, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ১৯৭১
* শেখ মুজিবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বৈঠক, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ১৯৭১
* পল্টনের জনসভায় একমনাদের প্রতি মশিহুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ১৯৭১
* উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ১৯৭১
* কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১

বাঙলা দেশকে কলোনী ও বাজার করে

রাখার দিন শেষ হয়েছে ঃ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন যে, বাঙলা দেশকে কলোনী ও বাজারে পরিণত করে রাখার দিন শেষ হয়ে গেছে। তিনি গতকাল (২০ মার্চ) শনিবার তার বাসভবনের সামনে কয়েকটি সমাবেশের উদ্দেশে একথা বলেন।

শেখ সাহেব দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর বর্তমান মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস-অসহযোগ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

গতকাল শনিবার শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকটি মিছিল দিনের বিভিন্ন সময়ে শেখ সাহেবের বাসার সামনে গিয়ে জড়ো হয়। ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মচারীরা গতকাল মিছিল সহকারে শেখ সাহেবের বাসভবনে গমন করে।

নির্বাচিত শিরোনাম

* গোপন আলোচনা নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে ঃ ভাসানী, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১
* ঢাকা বৈঠকে ভুট্টোর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে অভিনন্দন, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১
* আলোচনায় অগ্রগতি, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১
* মুজিব-মুফতি মাহমুদ সাক্ষাতকার, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১
* ওয়ালী-দৌলতানা রুদ্ধদ্বার বৈঠক, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১
* মুজিব-দৌলতানা বৈঠকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে

* ভুট্টো ঢাকা আসছেন, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ১৯৭১
* প্রেসিডেন্টের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের আলোচনা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ ১৯৭১
* ২৩ শে মার্চের কর্মসূচী, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ ১৯৭১
* ২৩ শে মার্চ ভাসানী ন্যাপের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠিত, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* টিভি কর্মচারীরা গতকাল (২৪ মার্চ) কাজ করেননি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* কয়েকজন নেতার ঢাকা ত্যাগ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া চলবে না, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* জয় বাংলা বাহিনীর উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবঃ ৭ কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ মার্চ ১৯৭১

অসহযোগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিক্ষোভ, শ্লোগান, মিছিল, জমায়েত, সভা-এ হচ্ছে আজকের ঢাকার পরিচয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকা মুক্তি পাগল মানুষের কলনিনাদে মুখরিত। শিশু, বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী এক কথায় বলা যায়, সর্বস্তরের সকল বয়সের মানুষ বাংলার মুক্তি সংগ্রামে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন, গতকাল শনিবার ছিল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আহূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের উনিশ দিন। অন্যান্য দিনের মতো ঢাকার রাজপথে গতকাল ঢল নেমে ছিলো। সংগ্রামী জনতার শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করেছে তারা ঢাকার আকাশ-বাতাস। এই শ্লোগানে কণ্ঠ মিলিয়েছে বস্তিতে বসবাসকারী নোংরা পেন্ট পরা খালি গায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে ব্যাংক, বীমা, মিল-কারখানা, দোকানপাট ও আরো ছোট বড়ো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা। মহিলারাও আজ পিছিয়ে নেই। পুরুষের সাথে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁরাও। মুক্তি পাগল এই নারী-পুরুষের পদভারে কম্পিত ছিল এই ঢাকার রাজপথ। মিছিল আর মিছিল। মিছিলের এক একটি মুখ যেন এক একটি বজ্র মানিক।

নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সভা

নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের উদ্যোগে গতকাল অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কমান্ডার জয়নাল আবেদীন। সভায় বক্তৃতা করেন লেঃ কমান্ডার ইমাম হোসেন, লেঃ সিদ্দিক, জনাব এ এম এ হোসেন, জনাব এম ইউ আহামদ।

জনাব এম এ হোসেন বলেন, পশ্চিমারা যে গত তেইশ বছর ধরে বাংলাদেশকে নানাভাবে শোষণ করেছেন তা নয়, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীরা নানা অত্যাচার আর উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম, এ, মজিদ আইয়ুব খানের চাইতে ষোল বছরের পুরানো হলেও বাঙ্গালী বলে তাঁকে কমান্ডার ইন-চীফ করা হয়নি। তিনি বলেন, স্বাধীনতা কেবল অর্জন করলে চলবে না, তা রক্ষাও করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীতে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়া সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন জনগণকে সামরিক শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

নির্বাচিত শিরোনাম

* শেখের অনুরোধ ভাসানী ঢাকা আসছেন, দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ মার্চ ১৯৭১
* আলোচনার কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ মার্চ ১৯৭১
* শ্রমিক নেতার দাবী ভুট্টোর বিচার চাই, দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১

২৩ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে ছুটি ঘোষণা

শৃঙ্খলার সহিত আন্দোলন করুন-শেখ মুজিব

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য আমাদের জনগণ যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ়সংকল্প। কাজেই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অবশ্যই অব্যাহত থাকিবে। আমি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে তাহাদের আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। আমি ক্ষতিকর উস্কানির বিরুদ্ধে বিনাশ সাধনকারীদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। যাহাতে জনগণ তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পায়, সেইজন্য আমাদের জনগণকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের "প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই কঠোর শৃঙ্খলা পালন করিতে হইবে।"

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (শনিবার) এক বিবৃতিতে জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। শেখ সাহেব বলেন, "এযাবৎ যেসব নির্দেশ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে পরবর্তীতে যেসব দেওয়া হইবে উহা সাপেক্ষে গত ১৪ই মার্চ ঘোষিত সংগ্রামের কর্মসূচী অব্যাহত থাকিবে, লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে ছুটির দিন হিসাবে পালিত হইবে।

শেখ সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, জনগণের আন্দোলন প্রত্যেকটি গ্রাম, শহর ও নগরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের দাবীর পিছনে প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশুকে আজ জমায়েত করিয়াছেন। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের সর্বত্র মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছে। বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বের নিকট লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসরমান দৃঢ়সঙ্কল্প ও ঐক্যবদ্ধ জনগণের এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্তে পরিণত হইয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন, "আমি সকল স্তরের জনসাধারণ তথা ক্ষেতের চাষী, কল-কারখানার শ্রমিক, ব্যাঙ্ক, অফিস, বন্দর ও সরকারী সংস্থার কর্মীদের অভিনন্দন জানাই– যাহারা আমাদের নির্দেশাবলীর কাঠামোতে অর্থনীতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে নিরলসভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। এইসব নির্দেশাবলী কার্যকর করিতে যে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য ছাত্র-শ্রমিক ও অফিস কর্মচারী সংস্থাসমূহকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিতে হয়। আমাদের জনগণ প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা নিজেরাই তাহাদের নিজস্ব কাজকর্ম দৃষ্টান্তমূলকভাবে চালাইয়া যাইতে পারে।"

দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১
সম্পাদকীয়

অগ্রসর! সংগ্রামী জনগণ!!

গণতন্ত্র ও বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করার জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম ধীরে ধীরে অথচ নির্ভুলভাবে সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। পাড়ায়-মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র গড়িয়া উঠিতেছে সংগ্রাম পরিষদ। ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একাধিক দলের নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং চলিতেছে। মহিলা সংগঠনের উদ্যোগেও চলিতেছে সংগ্রামের প্রস্তুতি। বর্ষীয়সী মহিলারা পর্যন্ত অংশ নিতেছেন কুচকাওয়াজে। ঢাকার বিভিন্ন পাড়ায়-মহল্লায় সংগ্রাম কমিটিগুলির উদ্যোগে কুচকাওয়াজ চলিতেছে। মেহনতী মানুষ সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রিগুলিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে কুচকাওয়াজের শব্দে। এসবের মধ্যে অনভিজ্ঞতা ও অপটুত্ব যতই থাকুক না কেন জনগণের বিপুল উদ্যম ও শাণিত সংকল্পকে খাটো করিয়া দেখার উপায় নাই।

এবারের আন্দোলনে জনতা প্রমাণ করিয়াছে যে, ঐক্যবদ্ধ জনগণের শক্তির সামনে দাঁড়াইতে পারে এমন কোন শক্তিই নাই। এই উপলব্ধি এবং উহা হইতে লব্ধ আত্মপ্রত্যয় জনগণের সংগ্রামী অভিযাত্রার পথে অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই সংগ্রামকে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে প্রয়োজন জনগণকে সংগঠিত করা। কেবল জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে সম্বল করিয়া কোন বড় সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না। বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ব্যতীত উহাকে কাজে লাগান যায় না। শুধু তাহাই নয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সুসংহত সংগঠন না থাকিলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ক্ষেত্রবিশেষে বিপথে পরিচালিত হইয়া প্রতিবিপ্লবের হস্তকে শক্তিশালী করিতে পারে। এই কারণেই জনগণকে সংগঠিত করার কাজকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। আমাদের এ যাবৎকালের আন্দোলনের মূল দুর্বলতাই হইতেছে এই যে, এগুলি প্রধানতঃ স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের। এই স্বতঃস্ফূর্ততা কাটাইয়া জনগণকে যথাযথভাবে সংগঠিত করিতে না পারিলে আন্দোলনের বিজয়সমূহ ধরিয়া রাখাও সম্ভব হয় না।

বর্তমান আন্দোলনের পটভূমিকায় জনগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, নিছক স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে দুরূহ ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া নেওয়া যায় না। তাই শহরে-গ্রামে সর্বত্র সাড়া পড়িয়াছে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের। কুচকাওয়াজ প্রভৃতির মাধ্যমে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের। আলাপ-আলোচনার দ্বারা বর্তমান সংকটের মীমাংসা হউক অথবা না-ই হউক, এই সংগ্রামী প্রস্তুতিকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। কারণ সাংগঠনিক প্রস্তুতিই জনতার বিজয় অর্জন ও রক্ষা করার একমাত্র পথ। তাই প্রস্তুতিকে কিছুমাত্র শিথিল করা চলিবে না। সংগ্রাম পরিষদগুলিকে জনগণের শক্তির আধার হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায় শুধু যে জনগণের সংগ্রাম পিছাইয়া পড়িবে তাহাই নয়, আজিকার জনগণের সংগ্রাম কমিটিগুলি ভবিষ্যতে গণবিরোধী শক্তির হাতিয়ারে পরিণত হইতে পারে।

নির্বাচিত শিরোনাম

* মুজিব-দৌলতানা বৈঠক, দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১
* মুজিবই ফর্মুলা প্রদানের অধিকারী- মুফতি মাহমুদ, দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১
* ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ, দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১
* ইয়াহিয়ার প্রতি ভাসানীর আবেদন: শেখের নেতৃত্বে সরকার গঠন করুন, দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১
* মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে ভাটা পড়িবে নাঃ মুজিব, দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৭১
* প্রেসিডেন্টের সহিত ২ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক : সশস্ত্র প্রহরাধীনে ভুট্টোর ইন্টারকন্টিনেন্টালে আগমন : সবকিছু ঠিক হইবে বলিয়া আশাবাদ প্রকাশ, দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৭১
* ইয়াহিয়ার প্রতি মাওলানা ভাসানী–মুজিবের নেতৃত্বে সরকার গঠন করিয়া বাংলা ত্যাগ করুন, দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৭১
* মুজিব-ইয়াহিয়া অনির্ধারিত বৈঠক, দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৭১
* কর্মীসভায় মোজাফফর : যে কোন অবস্থায় মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে, দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৭১
* মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো যুক্ত বৈঠক, দৈনিক সংবাদ, ২৩ মার্চ ১৯৭১
* প্রতিরোধ দিবস : জঙ্গী জনতার মিছিলে মিছিলে আন্দোলিত ঢাকা: মুক্তি সংগ্রামের দুর্জয় শপথ, দৈনিক সংবাদ, ২৪ মার্চ ১৯৭১
* রংপুরে কারফিউ, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* জনসমাবেশে শেখ মুজিব : জনগণের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র সফল হবে না, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* বিলম্বে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতে পারে : তাজুদ্দীন, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট : ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* পঃ পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের ঢাকা ত্যাগ, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১
* বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে বেলুচিরা মর্মাহত, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর সাথে পশ্চিমা নেতাদের বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (২৩ শে মার্চ) মঙ্গলবার শেষ বিকালে তাঁর বাসভবনে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি রাজনৈতিক দলের ছয়জন নেতার সাথে ৯০ মিনিট স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। এরা ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনাব মমতাজ দৌলতানা ও সর্দার শওকত হায়াত খান, ওয়ালী ন্যাপের খান আবদুল ওয়ালী খান ও জনাব গাউস বক্স বেজেঞ্জো, জমিয়্যতে ওলামায়ে ইসলামের মুফতী মাহমুদ এবং জমিয়্যতে ওলামায়ে পাকিস্তানের মাওলানা নূরানী। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে একত্রে আসেন এবং সবাই এক সাথেই প্রস্থান করেন।

বৈঠকশেষে বেরিয়ে আসার পর অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনাব মমতাজ দৌলতানা বলেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তারা সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। তারা আগেও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য গতকালের এই বৈঠকে মিলিত হন।

এই চারটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কোন বিশেষ যুক্ত প্রস্তাব দিয়েছে কিনা সাংবাদিকরা জানতে

বঙ্গবন্ধু পরে অন্য এক সমাবেশে বলেন যে, আমরা চাই আমাদের দাবী মেনে নেয়া হোক। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, যে কোন পরিস্থিতিই হোক না কেন আমরা লক্ষ্য অর্জন করবোই

চাইলে জনাব দৌলতানা বলেন যে, না-কোন যুক্ত প্রস্তাব নয়, আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করছি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব দৌলতানা বলেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্যে আমরা চাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকল কিছুর অবসান হোক। এ সম্পর্কে তারা আশাবাদী কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকরা পুনরায় জানতে চাইলে জনাব দৌলতানা বলেন যে, আমি তাই আশা করি।

এ সময় পাশে দাঁড়ালে বঙ্গবন্ধু এই কথার সূত্র ধরে সাংবাদিকদের বলেন যে, আমি সর্বোত্তমের জন্য আশা পোষণ করি এবং নিকৃষ্টতম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।

বঙ্গবন্ধু পরে অন্য এক সমাবেশে বলেন যে, আমরা চাই আমাদের দাবী মেনে নেয়া হোক। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, যে কোন পরিস্থিতিই হোক না কেন আমরা লক্ষ্য অর্জন করবোই।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, ৭ কোটি বাঙ্গালী আজ দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ। এটাই আমাদের বিজয়ের সবচেয়ে বড় আশাবাদ।

নির্বাচিত শিরোনাম

* সম্পাদকীয় : প্ররোচনা ও দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে, দৈনিক পাকিস্তান, ২১ মার্চ ১৯৭১
* ২৩ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বর্জন সপ্তাহ, দৈনিক পাকিস্তান, ২২ মার্চ ১৯৭১

Morning News, March 21, 1971

SBKCSP LEADERS CONDEMN FIRING AT JOYDEVPUR

(By our Staff Reporter)

Four leaders of Swadhin Bangladesh Kendria Chhatra Sangram Parishad in a joint press statement issued in Dacca yesterday condemned the firing on the unarmed civilians of Joydevpur by army personnel on Friday (19 March).

The SBKCSP Leaders paid tributes to the people of Joydevpur for bravely facing the troops.

The student leaders prayed for the salvation of the souls of those killed and expressed their sympathy for the family member of the deceased.

The signatories to the statement are Messrs Nur-e- Alam Siddiki, Shahjahan Siraj, ASM Abdur Rab and Abdul Kuddus Makhan.

Rajshahi NAP (R) for united movement

Rajshahi, March 20 (APP) : The district committee of National Awami Party (Wali Group) at a meeting recently decided to launch a united movement forming a joint front with Awami League, NAP (Bhashani Gorup), National League, Students League and Students Union.

The NAP (Wali Group) decided to form volunteer force with advocate Mohsin Pramanik as its chief. The NAP gave a call to all concerned to come forward and unite hands to make Bangladesh a happy country without exploitation and class domination.

The meeting gave full support to Sheikh Mujib's four points and demanded immediate transfer of power to Awami League and demanded enquiry into recent killings and release of political prisoners.

Morning News, 21 March 1971
People far ahead of political parties, says Bhashani

Selected Headlines

* Bhashani calls for unity, Morning News, March 22, 1971
* Bhutto is a lunatic, says Altaf, Morning News, March 22, 1971
* Mashiur Rahman warns against mass killing, Morning News, March 22, 1971
* Tajuddin condemns Army Firing, Morning News, March 25, 1971
* SBKCSP hails People for active response, Morning News, March 25, 1971
* At least fifty killed in army firing at Saidpur, Morning News, March 25, 1971
* Bhutto meets Gen. Peerzada, Morning News, March 25, 1971
* Mujib wanted separation right from'66, Morning News, March 30, 1971

PAKISTAN OBSERVER, March 21, 1971

Non-cooperation Waves of meetings, rallies

(By staff Correspondent)

The non violent Non-cooperation Movement launched by Sheikh Mujibur Rahman passed peacefully its 19th day on Saturday. The movement was launched on March 2 in protest against the posponement of the National Assembly session which was scheduled to meet on March 3 in Dacca and for the emancipation of the people of Bangladesh.

All Government and semi government offices, autonomous bodies and people from all walks of life continued to obey the directives of Sheikh Mujib.

Different organisations held meetings, rallies and processions on Saturday and reiterated their solidarity with the present movement and expressed their determination to continue the movement till the emancipation of the 75 million people of Bangladesh.

Some of the processions went to the residence of Sheikh Mujibur Rahman. Addressing the processionists separately Sheikh Mujib said that the movement would continue till the goal was achieved.

(সংক্ষেপিত)

লেখক: সহকারী সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রবন্ধ

বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

জাফর ওয়াজেদ

৫৩ বছর আগে সেই এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে বাঙালি ফিরেছিলেন স্বদেশে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ একটি দণ্ডে একাত্ম হয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্নে। 'আমি জানতাম, আমার বাংলা একদিন স্বাধীন হবেই। সেই বাংলায় আমি আবার আসিব ফিরে।' ফিরে এলেন তিনি এই বাংলায়–ধনধান্য পুষ্পভরা বসুন্ধরায়। দীর্ঘ দশ মাসের কারাবন্দি জীবন শেষে ফিরে এলেন সেই দেশে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।' কিন্তু জন্মভূমি তখন রানি নেই, ধ্বংসস্তূপে পরিণত। লাঞ্ছিত-নিপীড়িত জনতার জয়গান গেয়েছিলেন তিনি, সেই জয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনতে ঝরেছে লাখো লাখো মানুষের প্রাণ, মা-বোনের সম্ভ্রম, কোটি কোটি মানুষ হয়েছে সহায়সম্পদহীন, গৃহবসতিহীন। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বদেশে ফিরে এলেন তিনি। বলতেনও, 'আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি'। সাহসের ভেতর থেকে উজ্জীবিত তিনি ১০ মাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ জীবনে ভেঙে পড়েননি। মানসিক বল ছিল প্রবল। জানা ছিল, যে সংগ্রামের ডাক তিনি দিয়েছেন, যে লক্ষ্যাভিসারে চলার জন্য দেশের মানুষকে আহ্বান করেছেন–সে লক্ষ্য পূরণ হবেই। তাঁর দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম-আন্দোলন, শ্রমনিষ্ঠা–কোনো কিছুই বিফলে যাওয়ার নয়। সুকঠিন কারা অর্গল ভেঙে অতীতের মতোই বাংলার মানুষ তাঁকে মুক্ত করবেই। মৃত্যুকূপ খনন করে মানসিক নিপীড়নের মতো ক্রূরতার মুখোমুখি করেও বাঙালির জাতির পিতাকে পর্যুদস্ত করা যায়নি। পরশ্রীকাতরতা স্পর্শ করেনি, শাসকের দীর্ঘ নিপীড়নেও ভাঙেনি কখনো মনোবল, আপসের পথে ধাবিত হতে হয়নি–সেই তিনি একাকী নিঃসঙ্গ কারাগারে উচ্চারণ করতেন, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।'

তিনি ফিরে এসেছেন মুক্ত মানবের আলোকবর্তিকা নিয়ে। কারাগারের অন্ধকার থেকে বাংলাদেশের সূর্যালোকের দিকে করছেন যাত্রা। মুক্তির পরে বলেছিলেন, 'এই অভিযাত্রা হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বন্দিত্ব থেকে মুক্তির দিকে, হতাশা থেকে আশার দিকে।' ফিরে

এসেছেন তিনি নিজের জনগণের সঙ্গে যোগ দিতে। যে জনগণ তাঁরই ডাকে 'ঘরে ঘরে দুর্গ' গড়ে তুলেছিল। 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে' পড়েছিল। এনেছিল বাঙালির সহস্র বছরের সাধনার ধন স্বাধীন বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে গ্রেফতারের পর পাকিস্তানের কারাগারে আটক ছিলেন শুধু নয়, কোর্ট মার্শালে সাজানো বিচার করা হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে। পাকিস্তানি জল্লাদ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিচারের আগেই রায় ঘোষণা করেছিলেন। ফাঁসির হুকুম হলো। জেলখানার পাশে কবরও খোঁড়া হলো। বঙ্গবন্ধুর তখনও অটল মনোভাব। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি, জবানবন্দিও নয়, এমনকি আইনজীবী নিয়োগে অনীহাও দেখিয়েছিলেন। বাঙালি নামধারী কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

কোনো কিছুই দমিত করতে পারেনি বাঙালি জাতির বীরপুরুষ মহানায়ক শেখ মুজিবকে। একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। জাতির করণীয় কী, তাঁর অবর্তমানে সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি'। কিন্তু শেষ হুকুম তিনি দিয়েছিলেন ২৫ মার্চ রাতে, গ্রেফতার হওয়ার আগে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ সারা বিশ্ব জেনেছিল। আর সাড়ে সাত কোটি মানুষ রণাঙ্গনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। বাংলার মাটি, বাংলার জল রক্তে বারুদে একাকার। পুড়ছে ঘর, পুড়ছে মানুষ, তবু মাথা নত করেনি বঙ্গবন্ধুর বাঙালিরা। 'বাঙালি' নামধারী কতিপয় ধর্মের লেবাস পরে রাজাকার, আলবদর, আলশামস আর শান্তি কমিটি নাম ধারণ করে বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতেছিল, মা-বোনদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে, লুট করেছে সম্পদ, হত্যা করেছে জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষদের।

সারা বাংলা তখন জেলখানা। অস্ত্র হাতে তরুণ যুবা শত্রুহননে মত্ত। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারও গঠন হয়। যার রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু। সেই সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় যুদ্ধ। এগিয়ে আসে প্রতিবেশী দেশ ভারত। কোটি শরণার্থীর চাপ তখন ভারতের ওপর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন, মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহায়তা প্রদান শুধু নয়, বঙ্গবন্ধুর প্রাণনাশের পাকিস্তানি অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। চাপ প্রয়োগ করেছিলেন বিশ্বনেতাদের ওপর। একাত্তরেই 'বঙ্গবন্ধু ও রক্তাক্ত বাংলা' শীর্ষক এক নিবন্ধে নিরঞ্জন মজুমদার লিখলেন, 'দেশে দেশে নেতা অনেকেই জন্মান, কেউ ইতিহাসের একটি পঙ্‌ক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস। সারা বাংলার ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের পলিমাটিতে তাঁর জন্ম। ধ্বংস, বিভীষিকা, বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই পলিমাটিকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের চেতনায় শক্ত ও জমাট করে একটি ভূখণ্ডকে শুধু তাদের মানসে নয়, অস্তিত্বের বাস্তবতায় সত্য করে তোলা এক মহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মুজিব মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয় নেতার মতো এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিকতা।'

মৃত্যুঞ্জয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির দণ্ডাদেশ নিয়েও ভীত ছিলেন না। জীবন ও মৃত্যুকে একবিন্দুতে দাঁড় করিয়েছিলেন। জল্লাদরা কারাগারে আনাগোনাও করেছে। তাদের বলেছিলেন, একজন মুসলমান একবারই মরে, মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত নন, শুধু একটাই অনুরোধ, ওরা যেন তাঁর মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। না, ঘাতক জল্লাদবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি নানা উদ্যোগ নিয়েও। আন্তর্জাতিক চাপ ও পাকিস্তানিদের নিজদেশে জটিল পরিস্থিতির জন্য হানাদার পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু পৌঁছলেন লন্ডনে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। প্রবাসী বাঙালিরা আবেগে উৎফুল্ল হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানান।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পরও বাঙালি মুষড়ে পড়েছিল, বঙ্গবন্ধুর জন্য। চূড়ান্ত জয়ের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায় উদ্‌বেগ আনে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বাঙালি তখন সোচ্চার বিশ্বজুড়ে। প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুবিহীন স্বাধীন বাংলাদেশের মায়েরা দুহাত তুলে প্রার্থনারত বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য। উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা, সংশয় বাংলাজুড়ে। বঙ্গবন্ধুবিহীন ভবিষ্যৎ কী হবে–উৎকণ্ঠা ছিল। এরই মাঝে আশার আলো জ্বলে উঠল। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুক্তির খবর পেয়ে অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন, 'আপনি বন্দি ছিলেন, কিন্তু আপনার চিন্তাশক্তি ও চেতনাকে কারারুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপনি নিপীড়িত জনগণের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।' বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে পৌঁছার পর মিসেস গান্ধী বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের মুক্তি বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ এবং বিশ্বজনমতের একটি বিজয়।'

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ঘোষণায় দোলাচল বাঙালি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। এত রক্ত, এত যুদ্ধ, এত প্রাণহানি, ভূখণ্ড উদ্ধার–সবকিছুই তো তাঁরই আহ্বানে। সারা বাংলা 'জয় বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। ফিরে আসছেন তিনি, বাঙালির আরাধ্য পুরুষ। রাজপথে জনপদে বাঙালি পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে আনন্দে। অশ্রুসিক্ত চোখে সে কী অপার আনন্দ। অবর্ণনীয় সেসব মুহূর্ত। তরুণ প্রাণ কেঁদেছিল বৈকি। বাঙালির আশা, বাঙালির ভালোবাসা ফিরে আসছেন নিজ বাসভূমে। বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ একাত্ম ও অভিন্ন হয়ে ওঠে তখনই।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ব্রিটিশ বিমানে দিল্লি যান। রাজকীয় সংবর্ধনায় তিনি ভারতের জনগণের প্রতি তাদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। সেদিন এই উপমহাদেশে এক নতুন সূর্যোদয় হলো অনেক প্রত্যাশার, আশার ও আকাঙ্ক্ষার। আকাশবাণী পুরো ধারাবিবরণী প্রচার করে। তারপর বঙ্গবন্ধু স্বদেশের পথে। বেজে উঠল গান 'বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে তোমার স্বাধীন সোনার বাংলায়'। ১০ জানুয়ারি দিনটি ছিল অন্যরকম। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় পৌষের শীতকে ছাপিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছিল যেন সারা বাংলাদেশে। ১০ জানুয়ারির সকাল থেকেই সব স্রোত যেন বিধ্বস্ত তেজগাঁও বিমানবন্দরে। কখন আসবেন নেতা, কখন দেখতে পাবে বাংলার মানুষ আরাধ্য মহাপুরুষকে। লাখো লাখো মানুষের ভিড় রাজপথজুড়ে। কণ্ঠে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'। জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল। অজস্র বাঙালির অভিনন্দন বর্ষিত বঙ্গবন্ধু ময়দানে পৌঁছে কয়েক লাখ শ্রোতাকে উদ্দেশ করে এক গভীর আবেগপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের জন্য দিকনির্দেশনাপূর্ণ ভাষণ দেন। সারা বাংলার মানুষ একপলক দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব তখন। বেতারে ধারাভাষ্য শুনেও কেঁদে ফেলেন অনেকে। ৫৩ বছর আগের ১০ জানুয়ারি এক মহিমান্বিত ও অনন্য দিন বাঙালির ইতিহাসে। ১০ মাসের জেলজীবনে বঙ্গবন্ধু খানিকটা কৃশ হলেও কণ্ঠের তেজ ও মাধুর্য কমেনি। ক্রন্দনমথিত কণ্ঠে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। বাঙালি জাতি আবার যেন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হলো সেদিন। এবার তাঁকে দেশ গড়তে হবে। নতুন সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন বাংলায়। কিন্তু এ কোন বাংলা? যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। চারদিকে পাহাড়সমান সমস্যা, পাকিস্তানি হানাদাররা নয় মাসে দেশের প্রতিটি পরিবারে, প্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার ছাপ রেখে গেছে, তা নজিরবিহীন। তখন প্রয়োজন যুদ্ধের

নয় মাসে তিন কোটি মানুষের পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের পুনর্বাসন। এক কোটি গৃহত্যাগী শরণার্থীর নতুন গৃহনির্মাণ সহায়তা। সম্বলহীন শরণার্থীদের ক্ষুধার অন্ন, পরনে বস্ত্র, মাথা গোজার জন্য ছোট্ট গৃহ, প্রজ্বলিত শস্যক্ষেত্র আবাদ করা, বিরান নগর-বন্দর, হাটবাজার চালু করা, শিক্ষালয়, শস্যহীন গুদাম–এসবই তখন পুঞ্জীভূত সমস্যার পাহাড় হয়ে আছে। খাদ্য ঘাটতি তিন লাখ টন, দুই কোটি মানুষের আশ্রয়, হাজার হাজার মাইল যোগাযোগব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, শত শত ধ্বংসকৃত সেতু, কালভার্ট, হাটবাজার, হাজার হাজার বাস-ট্রাক, নৌযান চালু করা। স্বাধীন বাংলাদেশে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা আর অশ্রুতপূর্ব গণসমর্থন নিয়ে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন, তা সোনার বাংলা নয়, বিধ্বস্ত বাংলা। চারদিকে 'নাই-নাই' অবস্থা। আর তখন তিনি কেবল নেতা নন, রাষ্ট্রপতিও। একটি সদ্যস্বাধীন দেশের কর্ণধারও। গোটা দেশ তাকিয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে। সব ধরনের শোষণ থেকে জাতিকে মুক্ত করার অভিপ্রায় বঙ্গবন্ধুর। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু–যেখানে পর্বতপ্রমাণ সমস্যা। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীরা তখনও সশস্ত্র অবস্থানে দেশের কোথাও কোথাও। অস্ত্রের ছড়াছড়ি। পাকিস্তানি শাসকের শোষণ-নিপীড়নে ২৪ বছর ধরে জর্জরিত বাংলাদেশ, তার ওপর পাকিস্তানি হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞে লন্ডভন্ড। বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিসাধন–সবকিছুই তখন জরুরি হয়ে পড়েছে। আর প্রত্যেকটিই যেন দুরূহ। অথচ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে জরুরি কর্তব্য।

অবিস্মরণীয় সংবর্ধনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে তখন ভাবতে হচ্ছে দেশ গড়ার কথা। আর বাঙালি ভাবছে, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পূর্ণতা লাভের স্বাদ। আবারও সেই রেসকোর্স ময়দান, নেতা-জনতার আবারও মিলিত মাহেন্দ্রক্ষণ। নৌকা প্রতীকের আদলে তৈরি পাঁচশ ফুট দীর্ঘ মঞ্চ। মঞ্চে উঠে বঙ্গবন্ধু আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অশ্রুসিক্ত চোখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পাকিস্তানিদের জঘন্য ধ্বংসলীলার নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার বাংলাদেশ স্বাধীন, চিরকাল টিকে থাকবে।' বঙ্গবন্ধু সব শহিদ এবং নির্যাতিত-অত্যাচারিতদের কথা স্মরণ করে বললেন, 'আমি জানতাম না আবার আপনাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারব।...আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হয়েছিল। জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বলেছিলাম, আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, মানুষ একবারই মরে, দুবার নয়, হাসতে হাসতে মরব, তবু ওদের কাছে ক্ষমা চাইব না। মরার আগেও বলে যাব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, জয়বাংলা। বলব বাংলার মাটি আমার মা। আমি মাথানত করব না।' বঙ্গবন্ধুর আবেগপূর্ণ ও স্মৃতিচারণামূলক ভাষণের মাঝেই ছিল পরবর্তী দিকনির্দেশনা। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবেন না–এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ তোলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু বুঝলেন 'অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা' করতে হবে। আর সেই যাত্রায় বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ এবার গড়তে হবে। বললেন, 'গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। আজ আবার বলছি, আপনারা একতা বজায় রাখুন।' বঙ্গবন্ধু সাহস জোগালেন, 'বাংলাকে দাবায়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই।'

সাহস বঙ্গবন্ধুকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাঁর পরম কবি রবীন্দ্রনাথকে তিনি কারাগারে ভোলেননি। মঞ্চে সেই কবিগুরুকে আবার স্মরণ করলেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।' কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে। এমন কাজ তারা এবার করেছে, যার নজির ইতিহাসে নেই। সব সাহসিকতাকে সামনে রেখে বাস্তবের বাংলায় এসে বর্ণনা করলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কথা। পাকিস্তানি বাহিনী বিরান ভূমি বানিয়ে গেছে। লাখো মানুষের মুখে খাবার নেই। অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে সাহায্য চেয়ে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বানও জানান। সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানেরও অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু বুঝলেন স্বাধীনতা এসেছে- এখন বড়ো কাজ স্বাধীনতা রক্ষা। 'বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা। যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে–পূর্ণ হবে না', বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্রের দিকনির্দেশনা দিলেন। রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তিও ঘোষিত হলো, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি কোনো ধর্মীয় ভিত্তিতে হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।' পরে যুক্ত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। যে জাতীয়তাবাদ বাঙালিকে নতুন রাষ্ট্র তৈরির পথে নিয়ে গিয়েছিল।

সামনে যে বিশাল সমস্যা, বঙ্গবন্ধুর তা জানা হয়েছিল এই স্বল্প সময়কালের মধ্যেই। দূরদর্শিতা, দূরদৃষ্টিতে তিনি পুরো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চেহারা অবলোকন করেছিলেন। দেশ গড়তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সাহায্যের অনুরোধও রেখেছিলেন। 'আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরাই সবাই রাস্তা করতে শুরু করেন। যার যার কাজ করে যান।' বাংলাদেশে যৌথবাহিনীর সদস্য ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে বলে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন। বিশ্বের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন ও ব্যতিক্রম। একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না।' দেশ থেকে ঘুস-দুর্নীতি বন্ধের ঘোষণা দিলেন। 'বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না।' এসব দীপ্ত উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত বেসামরিক লোক মরে নাই।' স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। সেই সঙ্গে দাবি করেন বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে, 'একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।' বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসনও দাবি করেন।

বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে স্বদেশফেরা টুঙ্গিপাড়ার সেই সাহসী সন্তান থেকে বাঙালির জাতির পিতায় পরিণত শেখ মুজিব ভাষণে বাঙালির গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রা, দেশের সমাজ নির্মাণসহ দেশ গড়ার পথনির্দেশনা তুলে দিলেন। বাঙালির প্রত্যয়, সংগ্রাম, শৌর্য, বীর্য আর শপথের প্রতীক বঙ্গবন্ধু একটি নতুন দেশ ও জাতির চাওয়াপাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নকে ধারণ করে ভবিষ্যতের পথযাত্রায় বাঙালিকে এগিয়ে ধরলেন।

ডাক দিলেন দেশ গড়ার সংগ্রামে। ভগ্ন-বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠনসহ বাঙালির নতুন স্বদেশযাত্রা শুরু করেন বঙ্গবন্ধু বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি। জনসমুদ্রের মানুষ দুহাত তুলে সেই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ নিয়েছিলেন। ৫৩ বছর আগে বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি এক নতুন জাতি তাঁর নতুন আদর্শকে সামনে নিয়ে স্বদেশ গড়ার কাজে নেমেছিল। যে হাত অস্ত্র নিয়েছিল, সে হাতও পরিণত হলো কর্মীর হাতে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের কৈশোরকালে। আমাদের সৌভাগ্য আমরা বঙ্গবন্ধুর সময়ের সন্তান।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

মাথা নত করে নয় উঁচু করেই চলব

কারও কাছে হাত পেতে নয়, ভিক্ষা করে নয়; মাথা উঁচু করে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করতে। কাজেই আমরা মাথা নত করে নয়, মাথা উঁচু করেই চলব এবং বিশ্বদরবারে মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যাব।

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি 'একুশে পদক-২০২৪' দেওয়ার সময় প্রধান অতিথির ভাষণে সরকারপ্রধান এসব কথা বলেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক এ পুরস্কার তুলে দেন তিনি। মরণোত্তর পদক বিজয়ীদের পক্ষে তাদের স্বজন পদক নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা আমাদের যে মর্যাদা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মর্যাদাটা পঁচাত্তরের পর বাঙালি জাতি হারিয়ে ফেলেছিল। তবে আজ অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি, বাঙালি বিশ্বের দরবারে এখন মাথা উঁচু করে চলতে পারে। সেই মর্যাদা আমরা ফিরিয়ে এনেছি। এ মর্যাদা আমাদের সমুন্নত রেখেই এগিয়ে যেতে হবে।

শেখ হাসিনা আবারও তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আজ সুযোগ হয়েছে। দেশসেবার সুযোগ পেয়েছি। কাজেই যাঁরা জনগণের সেবা করেন, তাঁদের সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অবদান রেখেছেন বা দেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে যাঁরা অবদান রেখেছেন এবং সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ ফেব্রুয়ারি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে একুশে পদক তুলে দেন -পিআইডি

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সম্মাননা দিতে হবে।

পদকপ্রাপ্তদের একজন চাঁপাইনবাবগঞ্জের জিয়াউল হক। দই বিক্রির টাকায় তিনি গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি ও একটি বিদ্যায়তন। এছাড়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেওয়াসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান দেন।

ভাষণের শুরুতে ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান এবং ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়েই কারাবরণ করেন এবং কারাগারে থেকেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সংগঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সেই আন্দোলনের পথে হেঁটেই কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধিকার আদায় করেছি, স্বাধীনতা পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি যেমন পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল, তেমনই স্বাধীনতাসহ সব অর্জন এমনকি ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অবদানকেও মুছে দিতে চেয়েছিল।

একুশে পদকে ভূষিত হলেন ভাষা আন্দোলনে মৌ. আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর), ভাষা আন্দোলনে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ, শিল্পকলায় (সংগীত) বিদিত লাল দাস

(মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) শুভ্র দেব, শিল্পকলায় (নৃত্যকলা) শিবলী মোহাম্মদ, শিল্পকলায় (অভিনয়) ডলি জহুর, শিল্পকলায় (অভিনয়) চিত্রনায়ক এম. এ. আলমগীর, শিল্পকলায় (আবৃত্তি) খান মো. মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা), শিল্পকলায় (আবৃত্তি) রূপা চক্রবর্তী, শিল্পকলায় (চিত্রকলা) শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, শিল্পকলায় (মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং) কাওসার চৌধুরী, সমাজসেবায় মো. জিয়াউল হক, সমাজসেবায় আলহাজ রফিক আহামদ, ভাষা ও সাহিত্যে মুহাম্মদ সামাদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য), ভাষা ও সাহিত্যে লুৎফর রহমান রিটন, ভাষা ও সাহিত্যে মিনার মনসুর, ভাষা ও সাহিত্যে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (মরণোত্তর) এবং শিক্ষায় প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন পদক বিতরণ পর্বটি সঞ্চালনা করেন এবং পদক বিজয়ীদের সাইটেশন পাঠ করেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম স্বাগত বক্তৃতা করেন।

সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীসহ বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সমকাল ও আজকের পত্রিকা)

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫ মার্চ ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের খুঁজে পুরস্কারে সম্মানিত করুন

নীরবে নিভৃতে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে পুরস্কারে সম্মানিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৫ মার্চ ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পদক প্রদানকালে ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁরা বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে ও অন্যান্য এলাকায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে চলেছেন তাঁদের খুঁজে বের করে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য। কারণ, তাঁরা কখনোই সামনে আসেন না বা আসতে চান না। নিজস্ব উদ্যোগে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন অবদান রেখে যাচ্ছেন, তাঁদের পুরস্কৃত করতে পারাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।

স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের এই পুরস্কারপ্রাপ্তির ফলে মানুষের জন্য ও দেশের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ইতিহাস বিকৃতির যত চক্রান্তই হোক না কেন, আজকের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চায়, বুঝতে চায়। সেই প্রেরণা নিয়েই সামনের দিকে চলতে চায় এবং জীবনকে গড়ে তুলতে চায়। আর এটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো আশার বাণী। কোভিড-১৯ পরবর্তী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং একে কেন্দ্র করে নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতিতে কৃচ্ছ্রসাধন এবং দলের নেতাকর্মীসহ সামর্থ্যবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মানুষের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেজন্য আমরা এই রমজানে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করছি। আমরা ইফতার পার্টি বাদ দিয়েছি। আমাদের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সবাইকে আহ্বান করেছি, ইফতার পার্টি না করে ইফতারি সাধারণ মানুষের মাঝে আপনারা বণ্টন করেন। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান।

এ বছরের স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুস সাত্তার বীরপ্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক (মরণোত্তর) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম মো. নজিব উদ্দীন খাঁন খুররম (মরণোত্তর), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ড. মোবারক আহমদ খান, চিকিৎসাবিদ্যায় ডা. হরিশংকর দাশ, সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, ক্রীড়ায় ফিরোজা খাতুন এবং সমাজসেবা/জনসেবায় অরণ্য চিরান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী ও এস. এম. আব্রাহাম লিংকন। পুরস্কার হিসাবে প্রত্যেককে ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রাম স্বর্ণের পদক, সম্মানির অর্থের চেক ও সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন পুরস্কার বিতরণপর্ব সঞ্চালনা করেন এবং পুরস্কারজয়ীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের পক্ষে মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করেন। (সূত্র: ২৬ মার্চ ২০২৪, সমকাল)

বাংলা একাডেমিতে বই মেলার উদ্‌বোধন ও পুরস্কার বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি মুদ্রিত বইগুলোর ডিজিটাল প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলা উচিত। শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বই পড়ার অভ্যাস সবার থাকা প্রয়োজন। মা-বাবা যদি ছোটোবেলা থেকে শেখায়, তাহলেই অভ্যাসটা হবে। এখন জেলায় জেলায় বইমেলা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে তা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা নিয়ে যাব।

১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

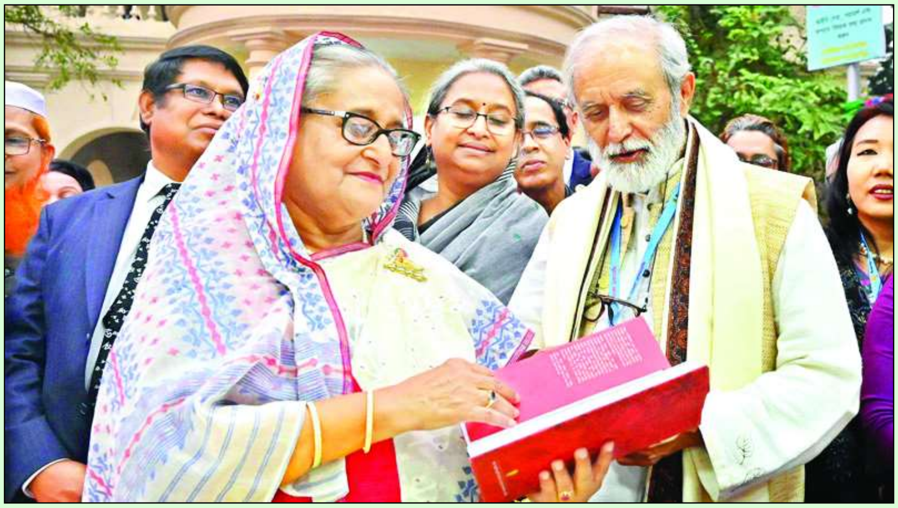

০১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে অমর একুশে বইমেলা উদ্‌বোধনের পর স্টল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা: দ্বিতীয় খণ্ড' এবং 'প্রাণের মেলায় শেখ হাসিনা' (বাংলা একাডেমিতে শেখ হাসিনার গত ২০ বারের ভাষণের সংকলন) বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৬ জনকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ বছর ১১টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন শামীম আজাদ (কবিতা), ঔপন্যাসিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী (কথাসাহিত্য), জুলফিকার মতিন (প্রবন্ধ/গবেষণা), সালেহা চৌধুরী (অনুবাদ), নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক (যৌথভাবে নাটক ও নাট্যসাহিত্য), তপঙ্কর চক্রবর্তী (শিশুসাহিত্য), আফরোজা পারভিন ও আসাদুজ্জামান আসাদ (মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণা), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও মো. মজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধুর ওপর গবেষণা), পক্ষীবিদ ইনাম আল হক (পরিবেশ/বিজ্ঞান ক্ষেত্র), ইসহাক খান (জীবনী) এবং তপন বাগচী ও সুমনকুমার দাশ (যৌথভাবে লোককাহিনি)। বাংলা একাডেমির সভাপতি ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আরিফ হোসেন ছোটন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত এবং অমর একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' পরিবেশিত হয়। এরপর ভাষাশহিদদের স্মরণে সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের পর বইমেলা ঘুরে দেখেন। (সূত্র: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সমকাল)

এবিএম মূসা-সেতারা মূসা সম্মাননা পেলেন আজাদীর সম্পাদক

সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য এবিএম মূসা-সেতারা মূসা সম্মাননা পেয়েছেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পত্রিকা দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এমএ মালেক। ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এবিএম মূসার ৯৩তম এবং সেতারা মূসার ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফাউন্ডেশন।

সম্মাননা গ্রহণ করে দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এমএ মালেক বলেন, 'সত্যকে প্রতিষ্ঠায় অনেক বাধা আসে। এসব বাধা অতিক্রমে সাহস থাকতে হয়। সেই সাহস এবিএম মূসার ছিল। পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকতায় অনেক বেড়াজাল ছিল। সেসব উতরে গেছেন এবিএম মূসা। তাঁর নামে চালু হওয়া পুরস্কার আমাকে দেওয়া হলো। এতে আমি খুবই গৌরবান্বিত। যত পুরস্কার পেয়েছি, এটিই আমার কাছে সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার।' অনুষ্ঠানে 'গণমাধ্যমে জেন্ডার পরিসর: নারীর নির্মিত এবং নারীর অংশগ্রহণ' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাবেরী গায়েন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে আজকের পত্রিকার সম্পাদক গোলাম রহমান বলেন, 'শুধু উপস্থিতিই নয়, এ অনুষ্ঠানে সবার মানসিকভাবে যে সংযুক্তি, সেটাই এ অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।' এ সময় সংসদ সদস্য আলাউদ্দিন নাসিম বলেন, 'মার্কেট ইকোনমির কারণে সংবাদ পণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই সংবাদপত্রের মালিকানার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সাবেক পরিচালক সীমা মোসলেম, প্রথম আলোর সংবাদ-পরামর্শক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কুরাতুল-আইন-তাহমিনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহিদ উল্যাহ লিপন, সাংবাদিক শাহনাজ মুন্নী প্রমুখ। (সূত্র: ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এমএ মালেককে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়

ইআরএফ-বিসিসিসিআই অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা পেলেন ১৭ সাংবাদিক

বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর প্রস্তাব করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশে সরবরাহব্যবস্থার লজিস্টিক খাতে দেশটিকে বিনিয়োগেরও আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের লজিস্টিক খাতে দুর্বলতা আছে। তাই এ খাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে চীনের। এছাড়া চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করলে দুই দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারি অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম বা ইআরএফ এবং বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। চীন-বাংলাদেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর সেরা প্রতিবেদনের জন্য প্রথমবারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ৪ ফেব্রুয়ারি এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বিশেষ অতিথি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশের চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। অতিথি ছিলেন বিসিসিসিআই-এর সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, মহাসচিব আল মামুন মৃধা, ইআরএফ-এর সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

ইআরএফ ও বিসিসিসিআই-এর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে পাঁচটি শ্রেণিতে ১৭ সাংবাদিক এ সম্মাননা পেয়েছেন। বিজয়ীদের অর্থ, ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট, অর্থ ও সনদ তুলে দেন। (সূত্রঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, প্রথম আলো)

ভোক্তা অধিদপ্তরের পুরস্কার পেলেন ছয় সাংবাদিক

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর হাত থেকে ভোক্তা অধিকারবিষয়ক নিউজ রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন সমকালের স্টাফ রিপোর্টার জসিম উদ্দিন বাদল

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের 'ভোক্তা অধিকারবিষয়ক নিউজ রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ছয় সাংবাদিক। ১৫ মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসাবে ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ অর্থ তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো এ পুরস্কার দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক–দুই ক্যাটাগরিতে তিনজন করে ছয়জনকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। প্রিন্ট ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন সমকালের স্টাফ রিপোর্টার জসিম উদ্দিন বাদল। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর সিনিয়র রিপোর্টার আলমগীর হোসেন এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের স্টাফ করেসপনডেন্ট সুকান্ত হালদার।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট শাহীদ আহমেদ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে জিটিভির স্টাফ রিপোর্টার তাহিদুল ইসলাম ও মোহনা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার রেজা খান। এছাড়া 'সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় গণমাধ্যমকর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল পর্যায়ের বিজয়ীদের মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এএইচএম সফিকুজ্জামান, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. আমীন হেলালী, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান প্রমুখ। (সূত্রঃ ১৬ মার্চ ২০২৪, সমকাল)

সোহেল তপু আকতার

ডিইউজের সভাপতি সোহেল ও তপু, সাধারণ সম্পাদক আকতার নির্বাচিত

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি পদে সাজ্জাদ আলম খান তপু ও সোহেল হায়দার চৌধুরী সমানসংখ্যক ভোট পেয়েছেন। তারা এক বছর করে দায়িত্ব পালন করবেন। লটারির মাধ্যমে প্রথম বছর সোহেল হায়দার চৌধুরী, দ্বিতীয় বছর সাজ্জাদ আলম খান তপু দায়িত্ব পালন করবেন বলে দুই প্রার্থীর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। টানা দ্বিতীয়বার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আকতার হোসেন। ১১ মার্চ দিনভর ভোটগ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ৯টায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া সিনিয়র সহসভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু, সহসভাপতি ইব্রাহিম খলিল খোকন, যুগ্মসম্পাদক মো. শাহজাহান মিঞা, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মুজতবা ধ্রুব, কোষাধ্যক্ষ সোহেলী চৌধুরী, আইনবিষয়ক সম্পাদক আসাদুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ মামুন শেখ, দপ্তর সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরী, কল্যাণ সম্পাদক শাহজাহান স্বপন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইস্রাফিল হাওলাদার এবং নারীবিষয়ক সম্পাদক পদে সুমি খান নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জিএম মাসুদ ঢালী, নাসরিন বেগম গীতি

(নাসরিন গীতি), এএম শাহজাহান মিয়া, আনোয়ার সাদাত সবুজ, সাজেদা হক, আহমেদ মুশফিকা নাজনীন, রারজানা সুলতানা ও অন্জন রহমান। (সূত্রঃ ১২ মার্চ ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

নির্বাচনে গণমাধ্যমের অনেক সহায়তা পেয়েছি: সিইসি

আরএফইডির সভাপতি সায়েম ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেছেন, গণমাধ্যমের গুরুত্ব অনেক, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। যখন সংসদ অকার্যকর থাকে, তখন গণমাধ্যম কথা বলে। নির্বাচনে গণমাধ্যম চমৎকার ভূমিকা পালন করে। ৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) বিট সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (আরএফইডি) নির্বাচন ও জাকির বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ অনুষ্ঠানে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, গণমাধ্যম যে স্বচ্ছতা প্রকাশ করে, তা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ঝুঁকি নিতে হয় গণমাধ্যমকর্মীদের। বিগত নির্বাচনে গণমাধ্যম বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। নানা চ্যানেল থেকে আমরা তথ্য পেয়েছি এবং সেই মোতাবেক কাজ করেছি।

আরএফইডির সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর, মো. আনিছুর রহমান, ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম, অতিরিক্ত সচিব ফরহাদ আহম্মদ খান, জুরি বোর্ডের সদস্য সাংবাদিক আশিস সৈকত, শেখ নজরুল ইসলাম, মহিউদ্দিন আলমগীর জুয়েল ও সাংবাদিক শাহজাহান সরদার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আরএফইডির সাধারণ সম্পাদক মুকিমুল আহসান হিমেল। প্রয়াত সাংবাদিক হোসাইন জাকিরের নামে পুরস্কারটি এ বছর চালু করেছে আরএফইডি। 'নির্বাচন ও গণতন্ত্র' বিষয়ে যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার কাজী জেবেল এবং টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার কাওসারা চৌধুরী কুমু ও বাংলানিউজের সিনিয়র করেসপনডেন্ট ইকরাম-উদ-দৌলা সেরা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার বিজয়ী প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট, নগদ অর্থ ও সনদ তুলে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সংগঠনটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক হোসাইন জাকিরের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

আরএফইডির নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এটিএন বাংলার চিফ রিপোর্টার একরামুল হক সায়েম। সাধারণ সম্পাদক আজকের পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার মো হুমায়ূন কবীর। ৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির ১৩টি পদে এক বছরের জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়। অন্য পদগুলোর মধ্যে সহসভাপতি কাওসারা চৌধুরী কুমু, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মাসুদ রায়হান পলাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ রিপন, দপ্তর সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান হাসিব এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাকিল আহমেদ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন হোমায়রা ফারুকী, আরেফিন শাকিল, আ ন ম মুহিবুব জামান, মো. আল আমিন ও হেদায়েত উল্যাহ সীমান্ত। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক আশিস সৈকত। নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন অনলাইন খবর সংযোগের সম্পাদক শেখ নজরুল ইসলাম ও ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের সিনিয়র রিপোর্টার মহিউদ্দিন আলমগীর জুয়েল। (সূত্রঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক কমান্ড

সভাপতি আজিজ সম্পাদক সেলিম

মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক কমান্ডের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে দ্য পিপলস লাইফের সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং বাসস-এর সাবেক ফটোসাংবাদিক সলিম উল্লাহ সেলিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

২৯ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাফর ইকবাল, চপল বাশার ও মাইনুল হক ভূঁইয়া। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন আবু তাহের, আকরাম হোসেন খান, মৃণাল কৃষ্ণ রায় ও সৈয়দ আহমেদুজ্জামান।

এছাড়া অন্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন সহসভাপতি একেএম করম আলী, যুগ্মসম্পাদক মফিজুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ স্বপন দাসগুপ্ত, দপ্তর সম্পাদক মো. নুরুল্লাহ খন্দকার তারেক এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক খোরশেদ আলী। (সূত্রঃ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪, সমকাল)

র‍্যাকের সভাপতি জেমসন সাধারণ সম্পাদক শাফি

দুর্নীতি দমন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‍্যাক) ২০২৪ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাত্তর টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জেমসন মাহবুব সভাপতি এবং এশিয়ান টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শাফি উদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

২ জানুয়ারি সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শেষে সদস্যদের ভোটে আগামী বছরের জন্য সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়। র‍্যাকের বিদায়ি সভাপতি আহম্মদ ফয়েজের সভাপতিত্বে রাজধানীর সেগুনবাগিচার একটি রেস্তোরাঁয় সংগঠনের এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সহসভাপতি পদে মাই টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মাহবুব সৈকত, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক যমুনা টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রাব্বি সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রতিদিনের বাংলাদেশের সৈয়দ ঋয়াদ, অর্থ সম্পাদক নিউজ টোয়েন্টিফোরের তাসলিমুল আলম তৌহিদ, দপ্তর সম্পাদক

আলী তালুকদার, দৈনিক আজকের পত্রিকার মারুফ কিবরিয়া প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আরটিভির আতিকা রহমান, কল্যাণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক এবং দৈনিক জনকণ্ঠের ফজলুর রহমান সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে এনটিভির বিশেষ প্রতিনিধি সফিক শাহীন, সাইফুল ইসলাম মন্টু, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও রফিক উজ্জামান বিজয়ী হয়েছেন।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলমের নেতৃত্বে নির্বাচন পরিচালনা করেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি শুকুর আলি শুভ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান খান, বর্তমান সহসভাপতি শামীম আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। (সূত্র: ২ জানুয়ারি ২০২৪, সমকাল)

ডিইউজে ইত্তেফাক ইউনিটের চিফ আবুল খায়ের ডেপুটি চিফ আল-মামুন পুনর্নির্বাচিত

দৈনিক ইত্তেফাকের ইউনিট চিফ পদে আবুল খায়ের এবং ডেপুটি ইউনিট চিফ পদে মোহাম্মদ আল-মামুন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। ২৫ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তাকক্ষে ডিইউজের (ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের) দৈনিক ইত্তেফাক ইউনিটের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ি ডেপুটি ইউনিট চিফ মোহাম্মদ আল-মামুনের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ি ইউনিট চিফ আবুল খায়ের। ইউনিটের গত দুই বছরের কার্যক্রম তুলে ধরেন আবুল খায়ের।

বক্তব্য দেন বার্তা-সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক অশোক কুমার সিংহ, সহকারী সম্পাদক মহসিন হাবীব, পালাপ্রধান আজাদ কবির, ইউনিটের সিনিয়র সদস্য আশেক খান আলেখীন, সুকমল চন্দ্র দাস, জাকিরুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, এইচএম তৌহিদ আজিজ প্রমুখ।

সভা শেষে দৈনিক ইত্তেফাক ইউনিটের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক অশোক কুমার সিংহ। নবনির্বাচিত ইউনিট চিফ ও ডেপুটি ইউনিট চিফকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাক (এনএনপিপি) ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি মো. আলমগীর হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আহসান পিন্টু, দৈনিক ইত্তেফাক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম আকতার ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলী আমজাদ মারুফ। (সূত্র: ২৬ জানুয়ারি ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

ডিক্যাব সভাপতি হাসিব সাধারণ সম্পাদক অপু

ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ডিক্যাব) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা ট্রিবিউনের নুরুল ইসলাম হাসিব এবং সাধারণ সম্পাদক এটিএন নিউজের আশিকুর রহমান অপু। ৩১ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে ২০২৪ সালের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের এ সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে সহসভাপতি পদে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) তানজিম আনোয়ার এবং ডেইলি ইন্ডাস্ট্রির রবিউল হক যৌথভাবে নির্বাচিত হন। এছাড়া যুগ্মসাধারণ সম্পাদক দৈনিক আমাদের সময়ের মো. আফিরুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ দৈনিক জবাবদিহির আতিকুর রহমান এবং দপ্তর সম্পাদক চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মোর্শেদ হাসিব হাসান নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল আইয়ের পান্থ রহমান, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের মীর মোস্তাফিজুর রহমান, ডিবিসির ইশরাত জাহান উর্মি, ডেইলি স্টারের পরিমল পালমা এবং বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরের মাসুম বিল্লাহ। এর আগে বিদায়ি কমিটির সভাপতি রেজাউল করিম লোটাসের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস ও কোষাধ্যক্ষ আতিকুর রহমান প্রতিবেদন পেশ করেন। (সূত্র: ১ জানুয়ারি ২০২৪, সমকাল)

ক্র্যাবের সভাপতি কামরুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ভোরের কাগজের কামরুজ্জামান খান এবং সাধারণ সম্পাদক যুগান্তরের সিরাজুল ইসলাম।

১৫ জানুয়ারি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় ফল ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল।

কমিটির অন্য নির্বাচিতরা হলেন সহসভাপতি শাহীন আবদুল বারী, যুগ্মসম্পাদক দিপন দেওয়ান, অর্থ সম্পাদক হরলাল রায় সাগর, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম রাজী, দপ্তর সম্পাদক কামাল হোসেন তালুকদার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নিহাল হোসাইন, কল্যাণ সম্পাদক ওয়াসিম সিদ্দিকী, আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাহীন আলম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম মানিক, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক ইসমাঈল হুসাইন ইমু এবং কার্যনির্বাহী সদস্য আলী আজম, মো. আবু দাউদ খান ও শেখ কালিমউল্যাহ। (সূত্র: ১৬ জানুয়ারি ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা

রুবেল হাওলাদার সভাপতি গাফফার সম্পাদক

কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ঢাকার ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে সভাপতি পদে আবারও বিজয়ী

হয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাকের কোর্ট রিপোর্টার অ্যাডভোকেট মো. রুবেল হাওলাদার। একই সঙ্গে সংগঠনের পুনরায় সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সময়ের আলো পত্রিকার কোর্ট রিপোর্টার গাফফার হোসেন ইমন। ৪ মার্চ ঢাকার জেলা জজ আদালতের পুরোনো ভবনের নিচতলায় অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া সিনিয়র সহসভাপতি তরিকুল ইসলাম, সহসভাপতি রবিউল ইসলাম রবি ও মুহাম্মদ ওয়হিদুন নবী বিপ্লব, সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক এমএ জলিল উজ্জ্বল, ট্রেজারার মুহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক কেএম খাইরুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. হাফিজ উদ্দিন, মো. শাহ আলম সোহাগ, মো. মফিজুর রহমান মাহফুজ, মুহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মো. জাকির হোসেন। এছাড়া উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হলেন শাহজাহান খান, সৈয়দ আহমেদ গাজী, মুনজুর আলম (মুনজু), আশরাফ উল আলম, চৈতন্য চন্দ্র হালদার, দুলাল মিত্র, এমদাদুল হক লাল, মো. আবুল কালাম আজাদ, মশিহুর রহমান ও আনোয়ারুল কবীর বাকুল। (সূত্র: ৫ মার্চ ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

স্মরণসভায় বক্তারা

অধিকার নিশ্চিত না হলে মেধাবীরা সাংবাদিকতায় আসবে না

সাংবাদিকদের বড়ো একটি অংশ তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। দিন শেষে চিকিৎসা করানোর ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্যও তাঁদের থাকে না। তাঁর অকালমৃত্যুতে পরিবার পড়ে যায় চরম অনিশ্চিত জীবনে। এভাবে চলতে থাকলে কোনো মেধাবী এ পেশায় আর আসবেন না। এজন্য সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

প্রয়াত সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান ও আবুল বাশার নুরুর স্মরণে ৫ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'প্রাক্তন ছাত্রলীগ সাংবাদিক ফোরাম' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

স্মরণসভা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শামীম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন এমপি, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, বর্তমান সভাপতি ওমর ফারুক, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেসসচিব হাসান জাহিদ তুষার, ডিইউজের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেনসহ সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, মানিক লাল ঘোষ, শাহেদ চৌধুরী, কামরুজ্জামান খান, মাহমুদুর রহমান খোকন, আবু সাঈদ, অমরেশ রায়, হালিমা আক্তার লাবণ্য প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক কাজী মোবারক হোসেন।

লায়েকুজ্জামান ও আবুল বাশার নুরুর স্মৃতিচারণা করে বক্তারা বলেন, তাঁরা সারা জীবন পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাদার সাংবাদিক হিসাবে শুধু সাংবাদিকতাই করেননি, প্রগতিশীল আন্দোলন ও চিন্তাচেতনাকে ধারণ করে সামনের দিকে যেমন এগিয়ে গেছেন, তেমনই উত্তরসূরিদের মাঝে সেই আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছেন। (সূত্র: ৬ মার্চ ২০২৪, সমকাল)

বিশ্বে ৩২০ সাংবাদিক কারাবন্দি

সিপিজের প্রতিবেদন

বিশ্বে পেশাগত কাজের জন্য গত বছরের ১১ মাসে ৩২০ জন সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তিন দশকের বেশি সময়ের মধ্যে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ইসরায়েল প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কারাগার হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭ ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে বন্দি করেছে দেশটি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) ১৯ জানুয়ারি এ তথ্য প্রকাশ করে। সংগঠনটির বার্ষিক 'জেলশুমারি' অনুসারে ১৯৯২ সালে সাংবাদিক গ্রেফতারের তথ্য নথিভুক্ত শুরু করার পর থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে আটক করেছে ইসরায়েল। গার্ডিয়ান পত্রিকার হিসাবে বর্তমানে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি আছেন ১৯ ফিলিস্তিনি সাংবাদিক। এ হিসাবে প্রথমবার দেশটি তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে। ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৮০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তবে গাজা কর্তৃপক্ষের হিসাবে এ সংখ্যা শতাধিক।

সিপিজের রেকর্ড অনুসারে, সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক বন্দি ছিলেন ২০২২ সালে, ৩৬০-এর বেশি। ২০২৩ সালে সাংবাদিকদের জন্য শীর্ষ তিন কারাগার হয়ে ওঠা দেশ হলো চীন (৪৪ জন), মিয়ানমার (৪৩) ও বেলারুশ (২৮)। এর পরেই ছিল রাশিয়া (২২) ও ভিয়েতনাম (১৯)। তালিকায় ইসরায়েলের পরই আছে তার ঘোর শত্রু ইরান (১৭)। সিপিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জোডি গিন্সবার্গ বলেন, 'আমাদের গবেষণা দেখায় বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ববাদ কতটা বিস্তৃত। সরকারগুলো সমালোচনামূলক প্রতিবেদন বন্ধ করতে এবং জনসাধারণের জবাবদিহি রোধ করতে বদ্ধপরিকর।'

সিপিজে বলছে, এটি এমন একটি বিশ্ব, যেখানে সাংবাদিকরা নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক নেতাদের নিন্দার মুখোমুখি হন। তালিকাভুক্ত বেশির ভাগ সাংবাদিককে তাঁদের সমালোচনামূলক কভারেজের কারণে প্রতিশোধ হিসাবে 'মিথ্যা সংবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মতো রাষ্ট্রবিরোধী' অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। বিশ্বের ৬০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটক করা হয়েছে। (সূত্র: ২০ জানুয়ারি ২০২৪, সমকাল)

এবারের অস্কারে সেরা অভিনেত্রী এমা স্টোন ও সেরা অভিনেতা চিলিয়ান মারফি

অস্কার পুরস্কার

ওপেনহাইমারের জয়জয়কার

বিশ্ব চলচ্চিত্রজগতের অন্যতম শীর্ষ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার নিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আগ্রহের কমতি নেই। কারা মনোনয়ন পেলেন, এ থেকে শেষ পর্যন্ত কাদের হাতে উঠল পুরস্কার, তা নিয়ে চলে বিস্তর গুঞ্জন, আলোচনা-সমালোচনা। যুক্তরাষ্ট্রের 'টিনসেল টাউন' লসঅ্যাঞ্জেলেস

শহরের ডলবি থিয়েটারে স্থানীয় সময় ১০ মার্চ রাতে বসেছিল ৯৬তম অস্কার পুরস্কারের আসর। আর এতে বাজিমাত করেছে পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারকের জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ওপেনহাইমার'। সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনেতা, সেরা পরিচালকসহ সাতটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে এই চলচ্চিত্র।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জে রবার্ট ওপেনহাইমারের জীবনের ঘটনা নিয়ে লেখা উপন্যাস 'দ্য ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি অব জে রবার্ট ওপেনহাইমার'-এর ওপর ভিত্তি করে গত বছর 'ওপেনহাইমার' নির্মাণ করেন ব্রিটিশ আমেরিকান পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলান। আলোচিত চলচ্চিত্রটি অস্কার পুরস্কারের ১৩টি ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পেয়েছিল। পদার্থবিদ ওপেনহাইমারের চরিত্রে অভিনয় করে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন আইরিশ অভিনেতা চিলিয়ান মারফি। একই ছবির জন্য সেরা পরিচালক হয়েছেন ক্রিস্টোফার নোলান। এই চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে সেরা পার্শ্ব-অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন 'আয়রনম্যান' খ্যাত রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রথমবার মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার জিতলেন। এছাড়া চলচ্চিত্রটির চিত্রগ্রহণের জন্য হোয়েতে ব্যান হোয়েতেমা, সম্পাদনার জন্য জেনিফার লেম এবং মৌলিক আবহ সংগীতের জন্য অস্কার জিতেছেন লুদভিগ গোরানসন।

এবারের অস্কারে ওপেনহাইমার ছাড়াও শ্রেষ্ঠ ছবির মনোনয়ন পেয়েছিল আমেরিকান ফিকশন, অ্যানাটমি অব আ ফল, বার্বি, দ্য হোল্ডওভারস, পাস্ট লাইভস, কিলারস অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন, মায়েস্ত্রো, পুওর থিংস ও দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট। অস্কার জয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কিলিয়ান মারফি বলেন, 'আমি কিছুটা হতবাক, খুবই অভিভূত, বিনীত ও কৃতজ্ঞ। আজ একজন আইরিশ হিসাবে এখানে দাঁড়াতে পেরে আমি গর্বিত।' ৪৭ বছর বয়সি এই অভিনেতা বলেন, 'আমরা পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক রবার্ট ওপেনহাইমারকে নিয়ে সিনেমা বানিয়েছি। বিশ্বে যাঁরা শান্তির জন্য কাজ করছেন, তাঁদের এ পুরস্কার উৎসর্গ করছি।' জীবনের প্রথম অস্কার পুরস্কার স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছেন সেরা পার্শ্ব-অভিনেতার সম্মানজয়ী রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। তিনি বলেন, 'আমি মাদকের কাছে জিম্মি ছিলাম। গ্রেফতার হয়েছি, জেলও খেটেছি। স্ত্রী সুসান আমাকে তাঁর জীবনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।' ব্যাটম্যান ট্রিলজি, মেমেন্টো, ইনসেপশন, ইন্টারস্টেলার, ডানকার্কের মতো আলোচিত চলচ্চিত্রের নির্মাতা ক্রিস্টোফার নোলান প্রথমবার শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে অস্কার পেয়ে অভিভূত। তিনি বলেন, 'যাঁরা আমার পাশে ছিলেন, আমার পুরো ক্যারিয়ারকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা রইল।'

অন্য যাঁরা পুরস্কার পেলেন

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন এমা স্টোন। 'পুওর থিংস'-এ অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তাঁর ঝুলিতে উঠেছে এ পুরস্কার। ওপেনহাইমারের পর এবারের আসরে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার জিতেছে এ চলচ্চিত্রটি। 'দ্য হোল্ডওভারস'-এর জন্য সেরা পার্শ্ব-অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ডে'ভাইন জয় র‍্যান্ডলফ। এছাড়া সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য ক্যাটাগরিতে অস্কার পেয়েছে জাস্টিন ট্রিয়েট ও আর্থার হারারির 'অ্যানাটমি অব আ ফল'।

এছাড়া সেরা রূপান্তরিত চিত্রনাট্য কর্ড জেফারসনের 'আমেরিকান ফিকশন', সেরা অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র 'হায়াও মিয়াজাকি' ও তোশিও সুজুকির 'দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হেরন', সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র যুক্তরাজ্যের 'দ্য জোন তাব ইন্টারেস্ট', সেরা পোশাক পরিকল্পনা হলি ওয়াডিংটনের 'পুওর থিংস'। সেরা প্রামাণ্যচিত্রের পুরস্কার জিতেছে ইউক্রেনের 'টোয়েন্টি ডেজ ইন মারিউপোল', সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র 'বেন প্রাউড ফুট' ও ক্রিস বাওয়ার্সের 'দ্য রিপেয়ার শপ', সেরা রূপসজ্জা ও কেশসজ্জার জন্য পুরস্কার জিতেছেন 'পুওর থিংস' সিনেমার নাদিয়া স্টেসি, জশ ওয়েস্টন ও মার্ক কুলিয়ার।

সেরা মৌলিক গান নির্বাচিত হয়েছে 'বার্বি' সিনেমার 'হোয়াট ওয়াজ আই মেড ফর' গানটি।

'পুওর থিংস' চলচ্চিত্রের জন্য সেরা শিল্প নির্দেশনার পুরস্কার পেয়েছেন জেমস প্রাইস, শান হিথ ও জুজা মিহাল। জনি বার্ন ও টার্ন উইলার্সের 'দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট' এবারের অস্কারের সেরা শব্দ পুরস্কার জিতেছে। সেরা ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস পুরস্কার জিতেছে 'গডজিলা মাইনাস ওয়ান'। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে ওয়েস অ্যান্ডারসন ও স্টিভেন রালসের 'দ্য ওয়ান্ডারফুল স্টোরি অব হেনরি সুগার'। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র হয়েছে ডেভ মালিন্স ও ব্র্যাড বুকারের 'ওয়ার ইজ ওভার! ইনস্পায়ার্ড বাই দ্য মিউজিক অব জন অ্যান্ড ইয়োকো'।

এবারের আসরে সম্মানসূচক অস্কার জিতেছেন মার্কিন অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা ব্যাসেট, মার্কিন কমেডিয়ান, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মেল ব্রুকস এবং চলচ্চিত্র সম্পাদক ক্যারল লিটলটন। (সূত্র: ১২ মার্চ ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

শোক সংবাদ

ইহসানুল করিম

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রবীণ সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইহসানুল করিম হেলাল (৭৩) আর নেই। ১০ মার্চ রাত ৮টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন।

ইহসানুল করিমের জন্ম ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯72 সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় নিজস্ব প্রতিবেদক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন ইহসানুল করিম। পরে তিনি বাসসের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের নয়াদিল্লিতে সংস্থাটির ব্যুরোপ্রধান ছিলেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বিবিসি, ভারতের পিটিআই, দ্য স্ট্যাটমেন্ট, ইন্ডিয়া টুডেসহ বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশি প্রতিবেদক হিসাবে সাংবাদিকতা করেছেন।

২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বাসসের প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে চার বছর দায়িত্ব পালনের পর অবসরে যান ইহসানুল করিম। একই বছরের ২০ মে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁকে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ দেয়। ২১ মে তিনি প্রেস সচিব হিসাবে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালের ১৫ জুন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব হিসাবে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর চুক্তির মেয়াদ দুবার তিন বছর করে বাড়ানো হয়।

১১ মার্চ বাদ জোহর বনানী কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। এর আগে বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী

দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী (৭১) আর নেই। রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৬ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৭ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। রেজোয়ান সিদ্দিকী দীর্ঘদিন কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। কিছুদিন ধরে শ্যামলীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সেখানেই নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁর মৃত্যু হয়।

রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সাবেক মহাপরিচালক। তিনি ১৯৫৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক বাংলায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হন। ছোটোগল্পকার ও কলাম লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। তিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক, বিজ্ঞান, প্রকৃতি-পরিবেশ, ফিকশন, অনুবাদ, সংকলন–সবকিছু মিলে অর্ধশতাধিক বই লিখেছেন।

লায়েকুজ্জামান

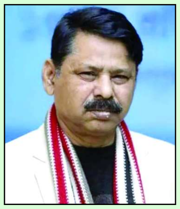

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দৈনিক রূপালী বাংলাদেশ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি লায়েকুজ্জামান (৬০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বনানীতে অফিসে কর্মরত অবস্থায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সহকর্মীরা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার ছোটো পাইককান্দি গ্রামে।

সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) স্থায়ী সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তিনি রূপালী বাংলাদেশ পত্রিকায় বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক দিনদর্পণ পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন দুই বাংলার ২৮ শীর্ষ ছাত্রনেতার সাক্ষাৎকার নিয়ে 'অজানা ১৯৭১' বইসহ অসংখ্য বইয়ের লেখক ছিলেন লায়েকুজ্জামান। তিনি দৈনিক মানবজমিন, কালের কণ্ঠ, সকালের খবরে কাজ করেছেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় ডিআরইউতে এবং বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী

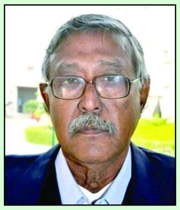

সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) সাবেক সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক উত্তরাঞ্চলীয় ব্যুরো চিফ প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (৮৫) ৪ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

বাদ মাগরিব সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে জানাজা এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান শেষে পৌরসভাধীন মালশাপাড়া কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

সৈয়দ আহমদ অটল

দৈনিক করতোয়ার প্রধান প্রতিবেদক বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আহমদ অটল (৭১) ৮ মার্চ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৫ মার্চ তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। বাদ জুমা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) প্রাঙ্গণে প্রথম ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে দ্বিতীয় জানাজা শেষে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। সৈয়দ আহমদ অটল জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ডিআরইউ-এর স্থায়ী সদস্য এবং বগুড়া জার্নালিস্ট ফোরামের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি বগুড়া শহরের চক সূত্রাপুর।

মনজুরুল ইসলাম

বগুড়ার আদমদীঘির মুরইল বাজারের একটি ফিলিং স্টেশনের পাশ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সাংবাদিক মনজুরুল ইসলামের দ্বিখণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মনজুরুল ইসলাম (৪৯) দৈনিক ভোরের কাগজের উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর বাড়ি আদমদীঘি উপজেলার উজ্জ্বলতা গ্রামে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, মনজুরুল রাত ১০টা পর্যন্ত গ্রামের একটি ক্লাবের অনুষ্ঠানে ছিলেন। সেখানে রাতের খাবার খেয়ে মোটরসাইকেলে এক আত্মীয়কে দুপচাঁচিয়া উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে রেখে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন সড়কের ওপর মনজুরুলের দ্বিখণ্ডিত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

আবুল কালাম আজাদ

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তিনি।

শাহজালাল রতন

সমকালের ফেনী জেলার সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক শাহজালাল রতন (৭৫) আর নেই। ২৫ জানুয়ারি কুমিল্লা ট্রমা হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহজালাল রতন দীর্ঘদিন দৈনিক বাংলায় কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে যুগান্তরের ফেনী জেলা প্রতিনিধি এবং সর্বশেষ ফেনীতে সমকালের নিজস্ব প্রতিবেদক ছিলেন। সেপ্টেম্বরে তিনি সমকাল থেকে অবসরে যান। এছাড়া ফেনী প্রেস ক্লাব এবং ফেনী রিপোর্টার্স ক্লাবে দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন তিন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের পদুয়া শিলরী গ্রামে হলেও বৈবাহিক সূত্রে ফেনীতে থাকতেন। পদুয়া শিলরী গ্রামে জানাজা শেষে তাঁর লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জ্যোতির্ময় মল্লিক

বরেণ্য ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক, সাংবাদিক জ্যোতির্ময় মল্লিক (৭২) আর নেই। তিনি ২১ জানুয়ারি রাত দেড়টায় রাজধানীর সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২২ জানুয়ারি ঢাকার পোস্তগোলা শ্মশানে প্রয়াতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

জ্যোতির্ময় মল্লিক কর্মজীবনে সাপ্তাহিক জনতার মুখ, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, সাপ্তাহিক খুলনা, দৈনিক গণদেশ, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক পাঠকের কাগজ, দৈনিক বঙ্গবাণী, ইউনাইটেড নিউজ সার্ভিস, দ্য বাংলাদেশ টুডে, নিউজ এক্সপ্রেস বিডি ডটকমে (ঢাকা) কাজ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত ছোটোদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা কুটুমপাখি ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস পুনর্মুদ্রণে কাজ করেছেন। তিনি খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের (কেইউজে) সাবেক সাধারণ সম্পাদক। পেয়েছেন শিশু একাডেমি অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার, খুলনা একাডেমি সম্মাননা, রংধনু সাহিত্য পুরস্কার, বাঁধনহারা লিটল ম্যাগ পদক, স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস সম্মাননা। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৬টি; যার মধ্যে রয়েছে জাদুর তুলি, গমের শীষ, ভালুকের জন্মদিন, পাহাড়চূড়ায় আগুন, অন্যদেশের রূপকথা, ফুল ফোটে ফাগুনে, গোয়েন্দার দুর্গতি।

ওমর ফারুক শামীম

অনলাইন পোর্টাল সংবাদ প্রকাশের বার্তা-সম্পাদক ওমর ফারুক শামীম (৫১) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৯ জানুয়ারি রাজধানীর মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ২০ জানুয়ারি বাদ জোহর খাগড়াছড়ি কোর্টবিল্ডিং সংলগ্ন কালেক্টরেট জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। ওমর ফারুক শামীম দৈনিক জনকণ্ঠের খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি হিসাবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। এছাড়া তিনি প্রতিদিনের সংবাদ, বাংলাদেশের খবর, জাগরণ, দিন পরিবর্তন, ভোরের আকাশ, বাংলাদেশ বুলেটিনসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

এ কে হিরু

খুলনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা এ কে হিরু (৬৫) ১০ মার্চ শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। সাংবাদিক এ কে হিরুর লাশ খুলনা প্রেস ক্লাবের ব্যাংকুয়েট হল চত্বরে আনা হয়। সেখানে গার্ড অব অনার এবং শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাদ মাগরিব নগরীর মুসলমানপাড়া দারুল উলুম মাদ্রাসা মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে তাঁর লাশ নিরালা কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলার খেশরা গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন খুলনায় বসবাস করতেন।

মাসুদুর রহমান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও দৈনিক সময়ের বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশক মাসুদুর রহমান (৫৬) ২৪ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দৈনিক সমাচার, ভোরের ডাকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন।

সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমেদ

সাপ্তাহিক হলিডের সম্পাদক সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমেদ (৮৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৫ মার্চ দুপুরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কামাল উদ্দিন আহমেদ দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। বাদ এশা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাঁর লাশ বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দুর্লভ বিশ্বাস

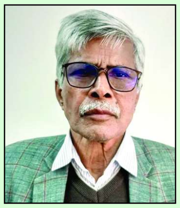

সমকালের মির্জাপুর প্রতিনিধি ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক কমান্ডার অধ্যাপক দুর্লভ বিশ্বাস (৭১) ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ৫ মার্চ রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬ মার্চ নিজ গ্রাম মির্জাপুর পৌরসভার বাওয়ার কুমারজানীর পারিবারিক সমাধিস্থলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

১৯৭১ সালে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রাবস্থায় মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন দুর্লভ বিশ্বাস। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরে মির্জাপুর কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। দৈনিক সংবাদ ও যুগান্তরের মির্জাপুর প্রতিনিধিও ছিলেন তিনি। সমকালের শুরু থেকেই মির্জাপুর প্রতিনিধি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য তিনি ২০২১ সালে বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন দুর্লভ বিশ্বাস।

তালাত মাহমুদ

শেরপুরের সাংবাদিক ও কবি তালাত মাহমুদ (৬৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩ মার্চ রাত আটটার দিকে জেলা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ৪ মার্চ বাদ জোহর শেরপুর শহরের তেরাবাজার জামিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম এবং নকলা উপজেলার বাছুর আলগা গ্রামে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তালাত মাহমুদ কবি সংঘ বাংলাদেশের সভাপতি, ঢাকা রিপোর্টের সহযোগী সম্পাদক ও শেরপুর প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন।

আহমেদ রাজীব রুবেল

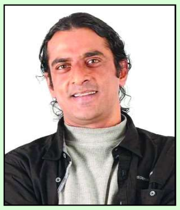

নন্দিত অভিনেতা আহমেদ রাজীব রুবেল (৫৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নির্মাতা নুরুল আলম আতিকের 'পেয়ারার সুবাস' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী ছিল সন্ধ্যায়। সিনেমাটিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন রুবেল। রাজধানীর বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্সে সেই প্রদর্শনীতে যোগ দিতেই তিনি বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আর পৌঁছা হয়নি।

নির্মাতা নুরুল আলম আতিক জানান, ছবির প্রিমিয়ারে আসার পথে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন আহমেদ রুবেল। এরপর স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আহমেদ রাজীব রুবেল ওরফে আহমেদ রুবেল ১৯৬৮ সালের ৩ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মঞ্চনাটক দিয়েই তাঁর উঠে আসা। নন্দিত নাট্যকার সেলিম আল দীনের 'ঢাকা থিয়েটার'-এ কাজের মাধ্যমেই তাঁর পথচলার সূচনা। এরপর টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক গিয়াস উদ্দিন সেলিমের 'স্বপ্নযাত্রা'।

পিআইবি'র সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

সাংবাদিকতা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা

–ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

সাংবাদিকতাকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসাবে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি সাংবাদিকতাকে সত্যের সঙ্গে কাজ করার মতো তুলনা করেন। ৯ মার্চ পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত পিআইবির সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আরও বলেন, সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অনেক। সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ সত্যকে ধারণ করে মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করা। তাই সত্য নিয়ে কাজ করলে ঝুঁকি থাকে বেশি। এদিক বিবেচনায় সাংবাদিকতা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। প্রধান অতিথি বলেন, সাংবাদিকের অন্যতম কাজ বস্তুনিষ্ঠতা। এজন্য সত্যের সঙ্গে যোগাযোগ দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে প্রতিবেদকের যোগাযোগ যত ভালো, তাঁর প্রতিবেদন তত উন্নততর ও বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং দর্শক, পাঠক ও শ্রোতার কাছে ততটা গুরুত্ব বহন করে। তাই নবীন ও বিদায়ি শিক্ষার্থীদের এসব বিষয় মাথায় রেখে কাজ করা বাঞ্ছনীয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করা আবশ্যক। নতুবা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতা উপযোগী প্রতিবেদন তৈরি দুরূহ হয়ে পড়বে। তিনি নবীন ও বিদায়ি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আরও বলেন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকলে ছবি, সংবাদ ও অন্য বিষয়াদি খুব সহজে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের গুজব প্রতিরোধে ফ্যাক্ট চেকের পাশাপাশি মোবাইল সাংবাদিকতার জ্ঞান আহরণ করা উচিত। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সিনিয়র সাংবাদিক মানস ঘোষ অপসাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিগন্ত নিয়ে কথা বলেন।

মানস ঘোষ আরও বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্যকে আমরা অনেক সময় নিউজ হিসাবে মনে করি। কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয়, এ পার্থক্য করার মতো সচেতনতা সৃষ্টি করা সাংবাদিকের কাজ। তাহলে জনমনে বিভ্রান্তি রোধ করা সম্ভব হবে। পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন বলেন, নিজেদের সমৃদ্ধ করতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ তাঁরই কন্যার হাত ধরে জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এনামুল হক চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকতা পেশা একটি মহান পেশা। এ পেশায় কর্মকে যথাযথ মূল্যায়ন করলে সাংবাদিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, পিআইবির সনদের একটি আলাদা মূল্যায়ন রয়েছে। যারা সনদ পেলেন এবং ভবিষ্যতে পাবেন–উভয়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য এর যথাযথ প্রয়োগ করা। এছাড়া অনুষ্ঠানে পিআইবির অধ্যয়ন শাখার প্রভাষক এবং সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী শুভ কর্মকারের সমন্বয়ে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পিআইবির অধ্যয়ন শাখার সহকারী অধ্যাপক ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী পংকজ কর্মকার ও প্রভাষক লাজিনা আক্তার জ্যাসলিন।

অনুষ্ঠানে পিআইবির সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের ৩৪ জন নবীন শিক্ষার্থী এবং পূর্ববর্তী ব্যাচের তিন কৃতী শিক্ষার্থী ও শ্রেণিকক্ষে সর্বাধিক উপস্থিত তিন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরামের সদস্যদের তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

কাজটি শেষ করতে নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন জরুরি। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ, প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক পিআইবির প্রতিবেদক এম. এম. নাজমুল হাসান, ইউডিজেএফবির সভাপতি মতিন আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল খান প্রমুখ। নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশের (ইউডিজেএফবি) ৩৫ জন সদস্য 'নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন' শীর্ষক এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

উন্নয়নকাজে সমন্বয়হীনতায় সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে

–প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, এমপি

উন্নয়ন কাজে সমন্বয়হীনতার কারণে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইইবি) সভাপতি ও কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। ১১ মার্চ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরামের সদস্যদের তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর বলেন, সমন্বয়হীনতার জন্য আমরা অনেক সম্পদ হারাচ্ছি। একটা সড়কে সিটি করপোরেশন কাজ করে চলে যাওয়ার পর আবার ওয়াসা কাজ করে। এরপর আবার অন্য একটা সংস্থা কাজ করে। বারবার খোঁড়াখুঁড়ির ফলে একদিকে যেমন জনভোগান্তি বাড়ে, অন্যদিকে একই খরচ বারবার হচ্ছে। তাই উন্নয়ন কাজগুলো পরিকল্পিত ও সমন্বিত হওয়া জরুরি।

আবদুস সবুর বলেন, পরিকল্পিত নগরী গড়তে হলে সেবা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে। আমরা যদি পরিকল্পিত নগর গড়তে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা যদি সবকিছুর সমন্বয় করে একটি মানবিক শহর গড়তে পারি, তাহলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজ অনেকটাই এগিয়ে যাবে। এজন্য সাংবাদিকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যার যার কাজ তাকেই করতে হবে। যদি প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদরা নিজ নিজ কাজ ঠিকমতো করেন, তবে নগরের দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে।

প্রধান অতিথি আরও বলেন, মেট্রোরেলসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ঢাকা বদলে যাচ্ছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল সম্পন্ন হয়ে গেলে ঢাকা একটি সুন্দর শহরে পরিণত হবে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ আমি এখানে কথা বলতে পারছি বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের অধিবাসী হওয়ার সুবাদে।

প্রধান অতিথি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে কাজ করে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের অগ্রসরমাণ সেই

প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ সমাজকে নাড়িয়ে দিতে পারে

–নুজহাত ইয়াসমিন

সাংবাদিকতা একটি বিস্তৃত বিষয়। সাংবাদিকের প্রতিবেদনের উৎকর্ষ পুরো সমাজ এমনকি বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিনোদন সাংবাদিকের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন।

১ ফেব্রুয়ারি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে বিনোদন বিটের সাংবাদিকদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন

বিনোদন বিটের সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দিচ্ছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন। এ সময় সভাপ্রধান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নুজহাত ইয়াসমিন আরও বলেন, আগে সিনেমা অর্থাৎ চলচ্চিত্রই ছিল একমাত্র বিনোদনের ক্ষেত্র। কিন্তু বর্তমানে বিনোদনের জন্য আরও মাধ্যম বা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, বিনোদন সাংবাদিকদের প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে অর্থাৎ প্রাইমারি সোর্সের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় 'মুখ ও মুখোশ' নামে। তিনি পুরোনো চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি ওটিটি প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে দর্শকের কাছে পৌঁছানোর কথা বলেন।

প্রশিক্ষণে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রশিক্ষণ বিভাগের সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমের বিনোদন বিটের ৩১ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সচেতনতা জরুরি

পিআইবি ও SACMID-এর যৌথ আয়োজনে 'Presenting research findings conducted in Dhaka to rumor situation' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য এ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগ, ছবি ও ভিডিয়ো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে উত্তরণের জন্য সচেতনতার পাশাপাশি মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি বলে মত দেন বক্তারা। ৮ ফেব্রুয়ারি 'Presenting research findings conducted in Dhaka to rumor situation' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরা এসব কথা বলেন। Kingdom Of the Netherlands-এর সহযোগিতায় South Asia Center For Media In Development (SACMID) ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) যৌথভাবে এ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। South Asia Center For Media In Development (SACMID)-এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দ কামরুল হাসান ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে এ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গোলটেবিল বৈঠকের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অসম্পাদিত মাধ্যম। তাই একে সংবাদমাধ্যম হিসাবে গণ্য করা যায় না। তাই বিভ্রান্তি প্রতিরোধে সচেতনতার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্তির কারণে শিশুর সুকুমার বৃত্তি প্রস্ফুটিত হচ্ছে না।

কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার নামিমা আক্তার বলেন, ফেক নিউজ যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের পুলিশ সুপার মো. নাজমুল ইসলাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার এবং এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের পার্থক্য তুলে ধরেন।

গোলটেবিল বৈঠকে তিনটি জেলার ওপর চালানো জরিপের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম। তিনি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সংখ্যা, ব্যবহারের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় তুলে ধরেন।

পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন বলেন, সামাজিক মাধ্যমে নারীকে সবচেয়ে বেশি হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। আলোচনায় এটিএন নিউজের প্রধান প্রতিবেদক আরাফাত সিদ্দিকী বলেন, বৈশ্বিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ বা গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং ১৯৯৫ সালে শুরু হলেও বাংলাদেশে এর যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালে। যদিও বাংলাদেশে গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ খুব একটা ফলপ্রসূ নয়, তারপরও কিছু নীতিমালার বিষয় তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপনে পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাকে যেমন জেন্ডার সহিংসতায় উসকে দিতে পারে, তেমনই নতুন কিছু ইতিবাচক ধারণাও সৃষ্টি করতে পারে।

গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা জজকোর্টের আইনজীবী রাকিবুল ইসলাম। তিনি সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমকে মানুষ গুলিয়ে ফেলে উল্লেখ করে বলেন, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এজন্য সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোলটেবিল বৈঠকে সংবাদকর্মী, বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, পুরোহিত, শিক্ষকসহ ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের তিনদিনের কর্মশালা সম্পন্ন

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে)-র সদস্যদের নিয়ে মোবাইল সাংবাদিকতা বিষয়ে

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যদের তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক চৌধুরী

তিনদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)'র ব্যবস্থাপনায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সনদ বিতরণ করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক চৌধুরী। সমাপনে সিইউজের সিনিয়র সহ-সভাপতি রুবেল খান, সাধারণ সম্পাদক ম. শামসুল ইসলাম, পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন ও সিইউজে'র সহসভাপতি অনিন্দ্য টিটো উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধনের প্রথম ধাপ হলো সাংবাদিকতায় গুজব প্রতিরোধ

–শফিকুল করিম সাবু

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য ফ্যাক্ট চেক বিষয়ক তিনদিনব্যাপী (৪-৬ মার্চ) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ মার্চ পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি শফিকুল করিম সাবু। তিনি বলেন, প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধনের প্রথম ধাপ হলো সাংবাদিকতায় গুজব প্রতিরোধ। এ কারণে সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই।

শফিকুল করিম সাবু আরও বলেন, সাংবাদিকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে ফ্যাক্ট চেক, মোবাইল ও ড্রোন জার্নালিজমে আরও অগ্রগতি সম্ভব। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ফ্যাক্ট চেক বা গুজব প্রতিরোধে সরকার যেমন কাজ করছে, তেমনই গণমাধ্যমকর্মীদেরও কাজ করতে হবে।

সমাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমদ ফ্যাক্ট চেক এবং ফ্যাক্ট চেক বিষয়ক বিভিন্ন কারিগরি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের ফলে সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সহজে গুজব প্রতিরোধ করা সম্ভব। গণমাধ্যমকর্মীর প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকলে ছবি, সংবাদ ও অন্য বিষয়াদি-সহ খুব সহজে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। গুজব প্রতিরোধে ফ্যাক্ট চেকের পাশাপাশি মোবাইল সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেন তিনি।

পিআইবির মহাপরিচালক বলেন, সাংবাদিকতার ধরন পরিবর্তন হওয়ায় সাংবাদিকদের দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) অ্যাডিজঅ্যাবলড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (ডিআরআরএ)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে (সাংবাদিক কমিউনিটি) সচেতন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এক কর্মশালা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পিআইবি সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। সার্বিকভাবে কর্মশালা পরিচালনা করেন ডিআরআরএ-এর উপদেষ্টা মিজ স্বপনা রেজা। প্রবন্ধ পাঠ করেন ডিআরআরএ-এর চিফ অপারেশন অফিসার রাবেয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে ৩০ জন গণমাধ্যমকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবি ও ডিআরআরএ-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে সচেতন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

ফ্যাক্ট চেক বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-এর সাবেক সভাপতি শফিকুল করিম সাবু। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

প্রয়োজন। কারণ, পরিমিতিবোধ না থাকলে সাংবাদিকতায় আকর্ষণীয় প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয় না। অনুষ্ঠানে পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

অন্যদিকে পিআইবির অপর একটি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সাংবাদিক জোটের সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। পিআইবির প্রশিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবির ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠিত

শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ পিআইবি ই-লার্নিং

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম অনুষঙ্গ। এটি বাস্তবায়নের জন্য পিআইবি বদ্ধপরিকর। এমনটাই বলেছেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। ২৭ মার্চ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে পিআইবির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।

জাফর ওয়াজেদ বলেন, ইনোভেশন বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম স্তম্ভ। তাই সেবা সহজিকরণ ও ডেটাবেজের তালিকাভুকক্তকরণের কাজটি পিআইবি সম্পন্ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) ও শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচনের জন্য গঠিত তিন সদস্যের কমিটির সদস্য মো. জাকির হোসেন বলেন, আজকের শোকেসিং উদ্বোধনের মাধ্যমে পিআইবি একটি মাইলফলক স্পর্শ করল। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করল পিআইবি। এটি পিআইবির যুগান্তকারী সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

ইনোভেশন অফিসার এবং গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. কামরুল হক বলেন, ইনোভেশনের মাধ্যমে সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। সেবাপ্রার্থীর সেবা পেতে কষ্টের লাঘব হবে। কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ার ও পিআইবির প্রভাষক শুভ কর্মকার, পিআইবির ইনোভেশন টিমের সদস্যসচিব ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন ভূঁঞা ও শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচনের জন্য গঠিত তিন সদস্যের কমিটির সদস্য, পিআইবির সহ-সম্পাদক আকিল-উজ-জামান খানসহ পিআইবির সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এ কর্মশালায় অংশ নেন।

অমর একুশে বইমেলায় পিআইবি'র অংশগ্রহণ

পহেলা ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শুরু হয় মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা-২০২৪। মেলায় এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অব শেখ মুজিবুর রহমান: ভলিউম-২'-সহ কয়েকটি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। একই সঙ্গে ২০২৩ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ এর বাংলা একাডেমি চত্বরে ৯৮২-৯৮৩নং স্টলে অংশগ্রহণ করেছে। মেলা উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির মূল চত্বরে প্রেস ইনস্টিটিউট

পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর স্টলটি সজ্জিত করা হয়। পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মেলার এ স্টলে রোস্টার ডিউটি পালন করেন।

এপিএ টার্গেট অনুযায়ী অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ উপলক্ষ্যে একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়। পিআইবির প্রকাশনাগুলোর সঙ্গে আগ্রহী পাঠকদের পরিচিত করানোর জন্য এ বুকলেট প্রকাশ করা হয় এবং মেলার স্টলে বুকলেটটি বিতরণ করা হয়।

পিআইবি প্রকাশনার ক্রেতারা সাধারণত গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, রাজধানী ও মফস্সলের সাংবাদিক ও উৎসাহী পাঠক হয়ে থাকেন। এবারের মেলায় পিআইবির স্টলে পর্যাপ্তসংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছে।

অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ উপলক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে 'সাংবাদিকতার অ আ ক খ', 'সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন' (তৃতীয় খণ্ড) এবং 'নিরীক্ষা-২৪৮তম সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে।

এবারের মেলার গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মেট্রোরেলে আগ্রহী পাঠক ও দর্শকদের সহজে মেলাস্থলে আসা-যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। এতে ক্রেতা, পাঠক ও দর্শক সহজে মেলায় যাতায়াত করতে পেরেছেন। তবে মেলার সময় মেট্রোরেলে সাধারণ টিকিট বিক্রি রাত ৮টায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টার পর দর্শক সমাগম কমে যেত। ভবিষ্যতে অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে মেলা চলাকালীন মেট্রোরেলে সাধারণ টিকিটে চলাচলের সময় যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

অমর একুশে বইমেলায় পিআইবি'র স্টলে মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

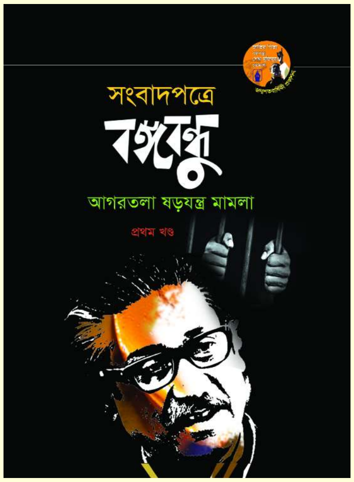

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা